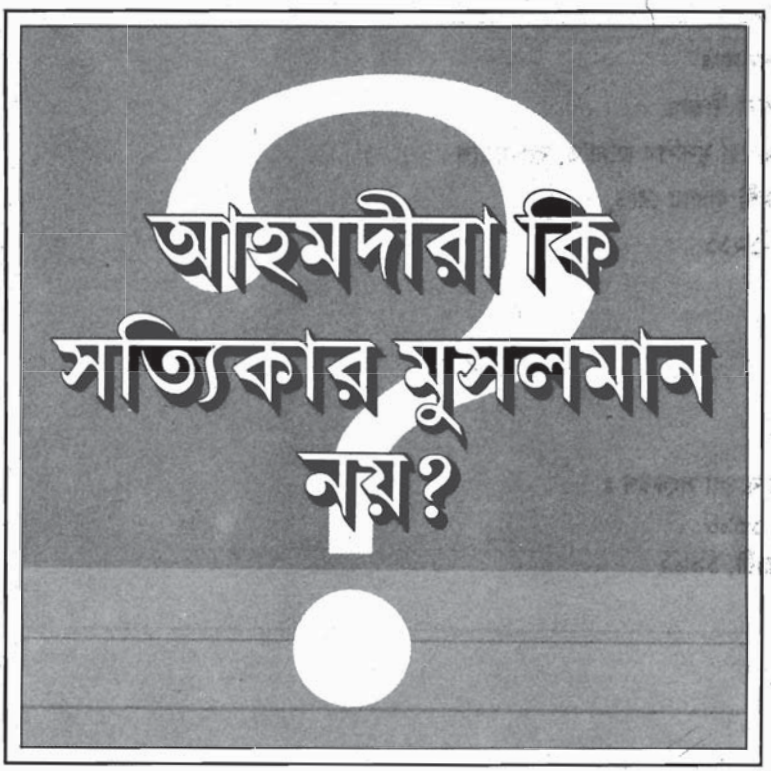

মূল ঃ এ, এস, মূসা

অনুবাদ ঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী

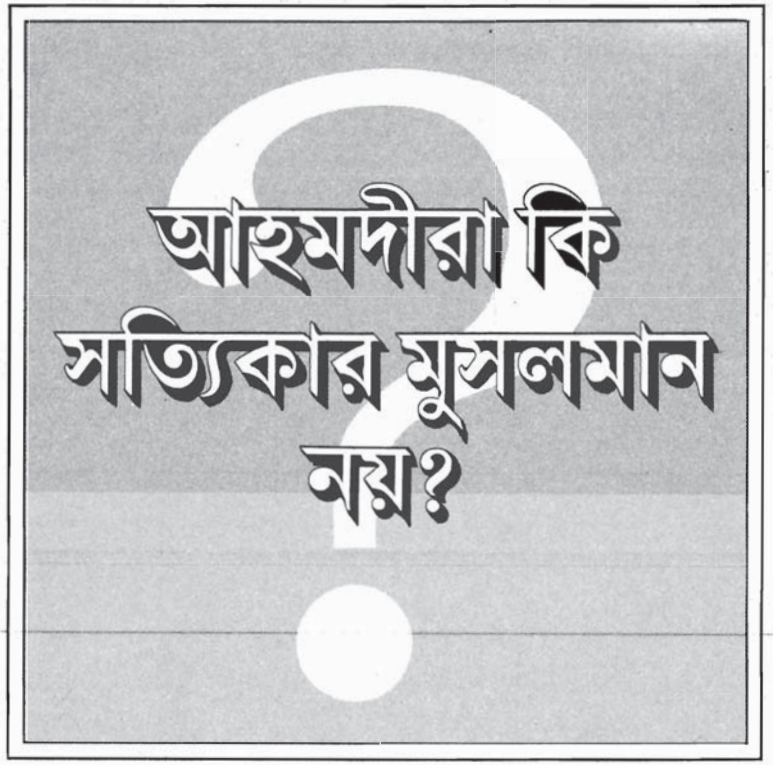

আহমদীরা কি সত্যিকার মুসলমান নয়?

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪,বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
মাঘ, ১৩৯৮
জানুয়ারী, ১৯৯২

পুনঃ প্রকাশ ঃ
শ্রাবণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
জুলাই, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
মতিঝিল, ঢাকা।

ভূমিকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৯৮৯ সনের ২৩শে মার্চ শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এ দীর্ঘ সময়ে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এ জামা'তের অগ্রগতি কখনও থেমে থাকেনি। আল্লাহ্‌র অপার করুণায় ইতিমধ্যে বর্ধিষ্ণু এই জামাত ১২৬টি দেশে * সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন অভিযোগ দ্বারা সত্যের প্রতিরোধ ব্যস্ত, বিনয়ের সাথে তাদের দৃষ্টি ইতিহাসের এ মহান ও চিরন্তন শিক্ষার দিকে আকর্ষণ করছি যে, তারা কখনও সফলকাম হয়নি।

আমাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ হয়ে থাকে বার বার আমরা পবিত্র কুরআন পাক হাদীস ও আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নতের আলোকে ওসবের জবাব দিয়ে আসছি। 'আহমদীরা কি সত্যিকার মুসলমান নয়?' পুস্তকে আবারও ভিন্ন আংগিকে জবাব দেয়া হলো। পাঠক-পাঠিকাদের নিকট নিরপেক্ষ বিচারের আবেদন রইল।

উর্দু পুস্তকের মূল (জবাব) লেখকও এর বাংলায় অনুবাদক এবং যারা এর প্রকাশনার সাথে যেভাবে জড়িত আছেন আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের সবার কল্যাণের জন্য দরদে-দিলে দোয়া করছি। আমীন।

খাকসার

১৫ই মাঘ, ১৩৯৮
২৩শে রজব, ১৪১২
২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।

** ১৯৯৮ সন পর্যন্ত ১৬০টি দেশ– প্রকাশক*

প্রকাশনা সেক্রেটারীর নিবেদন

কারে মোল্লা ফি সাবিলিল্লাহ ফাসাদ,
কারে কাফির ফি সাবিলিল্লাহ জেহাদ।
মোল্লার কাজ শুধু ঝগড়া বিবাদ,
কাফের যাকে বল সেই করে জিহাদ।

বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেম আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "যারা জন্ম নিল প্রেম-প্রীতি ও ইনসাফের দ্বারা বিশ্বের সকল কাফিরকে মোমিন করার জন্য তারাই ফতওয়ার তরবারী দ্বারা নিজেকে ছাড়া সকল মোমিনকে কেটে ছেটে করে দিল কাফের (মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, ইত্তেফাক, ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৫)।

সত্যি, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, মৌলভী সাহেবরা ইসলাম প্রচার দ্বারা অমুসলমানকে মুসলমান না করে যে মুসলিম জামাত বিশ্বে দিন রাত ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে তাদেরকে অমুসলমান বানাবার জন্য রাত দিন মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ এনামুল হক লিখেছিলেন, "একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্যরূপে ইসলাম প্রচারে মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না" (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ৩৪ পৃঃ)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচারের ফলে অগণিত মানুষ পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছে। বিবাদ নয়, হিংসা নয়, অস্ত্রবল নয় বরং প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা দ্বারা এই জামা'ত শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মোল্লা মৌলভী সাহেবরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য মিথ্যা প্রচারণা এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাঁধার সৃষ্টি করে চলেছেন। তারা ত্রিত্ববাদ, নাস্তিকতা বা বহু ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে একটি বইও রচনা না করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে অসংখ্যা ছোট বড় বই প্রকাশ করে চলেছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রায় প্রত্যেকটি আপত্তি আসে পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানী মৌলভীদের বইগুলি অনুবাদ করে এদেশে নানা এজেন্সির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। আর্থিক সাহায্যও আসে বিদেশ থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এসবের জবাব দিই। কারণ সাধারণ মানুষ যারা মূল বই-পত্র পড়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে অক্ষম তারা এই সব মিথ্যার বেসাতিতে বিভ্রান্ত হ'তে পারেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আহমদী জামা'তের বিরূদ্ধে এহেন মিথ্যা প্রচারণায় পীর বা মৌলবী সাহেবদের স্বার্থ কি? এর উত্তরে এক কথায় বলা যায়,-কায়েমী স্বার্থ। ইসলামের নামে রাজনীতি, পীর-মুরিদী, রুজি-রোজগার এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে ওরা

ভীত হয়েই নিজেদের স্বার্থে এই হীন পথ অবলম্বন করে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি বলেছেন, "এর পরে মুক্তবুদ্ধির নির্মোহ দৃষ্টির, সৎসাহসের এবং কাল-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন আহমদীয়ারা ওরফে কাদিয়ানীরা এ শতকে।.....

এ মতবাদ হচ্ছে ধীর বুদ্ধির ও স্থির বিশ্বাসের শিক্ষিত মানুষের। আজ ঢাকায় রাজনীতিক মতলবদুষ্ট লোকেরা আহমদীদের এতকাল পরে অকারণে অমুসলিম বলে ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে সরকারের কাছে। এ বোধ হয় জামা'ত, তবলীগ, খানকা দরগাহওয়ালারা ও কেরামত বুযর্গীর ভেলকীবাজ পীরেরা তাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরূপতার প্রতিকার হিসাবেই গণ-দৃষ্টি কাদিয়ানীদের দিকে ফেরানোর বৃথা প্রয়াস মাত্র" (আজকের কাগজ, ১/২/৯২)।

এ সঠিক মূল্যায়ন দেশবাসীকে বিরুদ্ধবাদী মোল্লা-মৌলবীদের ধূম্রজাল থেকে মুক্ত করুক, এই কামনাই করি। সকলের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, আসুন, মিথ্যা প্রচারণায় অমূল্য সময় নষ্ট না করে মানব কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি।

খাকসার

জানুয়ারী, ১৯৯২–

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী
প্রকাশনা সেক্রেটারী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আহমদীরা কি সত্যিকার মুসলমান নয়?'- পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা প্রকাশ করছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের এই পুস্তিকাটি আঞ্জুমানে দ্বীনে হানীফ নামক একটি সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকার (মূল উর্দু থেকে অনূদিত) জবাব। 'দ্বীনে হানীফ ঐ পুস্তিকাটি- আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুল ভাবে প্রচার করছে। সুতরাং আমরা আমাদের জবাব-এর পুনঃপ্রকাশ করছি। এতে বাংলা-ভাষাভাষী ভাইয়েরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে পারবেন এবং ঐ সমস্ত বিভ্রান্তিকর রচনার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্তাআলা সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করুন। আমীন।

খাকসার

আগষ্ট, ১৯৯৮

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

নং	বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা
১।	লুধিয়ানভী সাহেবের পুস্তক সম্বন্ধে একটি পর্যালোচনা	৯
২।	আহমদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের বৈধতা	১১
৩।	বেরেলভীদের বিরুদ্ধে দেওবন্দীদের ফতওয়া	১২
৪।	শিয়ারাও কাফের	১২
৫।	আহলে হাদীসগণও কাফের	১২
৬।	জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতওয়া	১২
৭।	বেরেলভী আলেমদের ফতওয়া	১৩
৮।	দেওবন্দীদেও তদ্রুপ অন্য মতালম্বীদের সম্পর্কে মক্কা ও মদীনার আলেমদের ফতওয়া	১৩
৯।	আহলে সুন্নত আলেমদের ফতওয়া	১৩
১০।	ভয়ানক ধরনের কুফরী	১৪
১১।	আহমদীদেরকে হত্যা করার ফতওয়া	১৪
১২।	উম্মতী নবুওয়ত কি বন্ধ ?	১৫
১৩।	হুযূর (সঃ)-এর পরে কি কোন নবী নেই?	১৬
১৪।	শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কে হবেন?	১৯
১৫।	রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মোহরে নবুওয়তের প্রভাব	২৩
১৬।	সকল নবীদের 'খাতাম'	২৪
১৭।	মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নবুওয়ত	২৬
১৮।	অন্তর্যামী মৌলভী সাহেব!	২৮
১৯।	নতুন শরীয়ত প্রবর্তনের মিথ্যা অপবাদ	৩৭
২০।	আহমদীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার	৪৩
২১।	সেই সুর গায় যা আসমান গায় না	৪৪
২২।	আরও একটি মিথ্যা অপবাদ	৪৫
২৩।	রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণ	৪৫
২৪।	বার ইমাম	৪৬
২৫।	চার ইমাম	৪৬
২৬।	উম্মতের পুণ্যবান ব্যক্তিগণ	৪৬
২৭।	মৌলবী সাহেবের একটি অযৌক্তিক দৃষ্টান্ত	৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীরা কি সত্যিকার মুসলমান নয়?

লুধিয়ানভী সাহেবের পুস্তিকা সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা

উল্লিখিত পুস্তিকাখানি প্রকৃতপক্ষে মৌলভী মোহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেবের একটি বক্তৃতা, যা তিনি দুবাই-এর শইয়খ মসজিদে পহেলা অক্টোবর, ১৯৮৫ সালে নামাযে ইশার পর প্রদান করেন। এর উদ্দেশ্য সংকলকের দৃষ্টিতে আহমদী ও অন্যান্য কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা।

প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কুরআন করীম ও সুন্নতে নব্বীর উপর সাধারণ ধ্যান-ধারণা রাখেন তিনিই এই পুস্তিকাটি পাঠ করার পর আমাদের সাথে একমত পোষণ করবেন যে, পুস্তিকাটির ভাষা অত্যন্ত অশালীন এবং উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ এবং তা উপস্থাপনের ভঙ্গী ও অত্যন্ত নিম্নমানের। এই বই আহমদীয়ত ও উহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদের স্তুপ বিশেষ। ইহা পাঠে হযরত নবী আকরম (সঃ)-এর নিম্নলিখিত বরকতময় হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে যায়। দুবাই এর মসজিদের প্রদত্ত অত্র বক্তৃতা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার একটি বহির্প্রকাশ মাত্র। আঁ হযরত (সঃ) বলেন,

يو شك ان يا تى زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولا
يبقى من القران الا رسمه مساجد هم عامرة وهى خراب
من الهدى علماءهم شر من تحت اديم السماء من
عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود

(মেশকাতুল মসাবীহ্ কিতাবুল ইলম, তৃতীয় খন্ড)

"অর্থাৎ মানুষের উপর এমন একটা যুগ আসবে যখন ইসলামের কেবলমাত্র নাম অবশিষ্ট থাকবে, কোরআন শরীফের শুধু অক্ষরগুলো থাকবে, বাহ্যতঃ তাদের মসজিদগুলো জাঁকজমক পূর্ণ হবে, কিন্তু প্রকৃত হেদায়াত বঞ্চিত হবে। তাদের আলেম সমাজ আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে পরিণত হবে, সকল অশান্তি তাদের মধ্য হতে উদ্ভূত হবে এবং তাদেরই মধ্যেই তা আবার প্রত্যাবর্তন করবে।"

এই ফেতনাবাজীর রূপায়ন 'উলামাউহুম' (তাদের তথাকথিত আলেমগণ) যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও যুগ-ইমামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ফাসাদের যে আন্দোলন শুরু করেছে তা নযীরবিহীন। আহমদীদের বিরুদ্ধে এহেন জঘন্য অভিযান অথচ তুলানমূলকভাবে অন্যান্য অমুসলিমদের প্রতি তথাকথিত আলেমদের ব্যবহার দেখে সাধারণ মুসলমান আশ্চর্য হয়ে যায় যে, আলেম সমাজের ক্রোধ ও বিদ্বেষ কেন শুধু আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ হচ্ছে। পৃথিবীতে অগণিত অন্যান্য ধর্ম ও সংগঠন রয়েছে, যেমন খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি, যারা শুধু তাদের আলেম সমাজের মতেই অমুসলিম নয় বরং তারা নিজেরাও উচ্চকণ্ঠে অমুসলিম হওয়ার ঘোষণা দিয়ে থাকে এবং এ কথার উপর গর্বও করে। সেই সব ধর্মগুলির মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অবস্থা হলো এই যে, তারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে প্রচারকার্য চালিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে খৃষ্টান বানাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু তারা শক্তিমান জাতি সেহেতু তাদের ক্ষেত্রে আলেম সমাজের ক্রোধ ও বিদ্বেষ একেবারে নিস্তেজ। উল্লিখিত মৌলভীর বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে এই পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে। এই পুস্তিকাতে তার প্রশ্নগুলো তুলে ধরে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তা করার পূর্বে প্রশ্নগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করা আবশ্যক।

সারা পৃথিবীতে ৫০০ কোটি লোকের বসবাস বলে ধরা হয়। এর মাঝে মুসলমানদের সংখ্যা ১০০ কোটি। অতএব অমুসলিম বিশ্বের একটি বড় শ্রেণী এমন রয়েছে যারা ইসলাম ও ইসলামী বিশ্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তায় মগ্ন। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'ফোকাস' অনুসারে খৃষ্টান গীর্জা আগামী এগার বৎসরে পৃথিবীর অর্ধেক অধিবাসীকে খৃষ্টান বানানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং তার জন্য সকল প্রকারের মাধ্যমকে কাজে লাগাচ্ছে (সাপ্তাহিক লাহোর ১৫ই জুলাই, ১৯৮৯, পৃঃ ৪)।

বস্তুতঃ ইসলামী বিশ্ব বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে ইসলামের শত্রুদের লক্ষ্যস্থল হয়ে আছে। কিন্তু ইসলামের আলেমদের সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

মুসলমানদের চারিত্রিক অধঃপতন যতই মারাত্মক হোক এ বিষয়ে তাদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই। ইসলামী বিশ্বের শিক্ষা ও জ্ঞানগত অবস্থার পর্যালোচনা করে একটি নাম করা পত্রিকা লিখেছে ঃ

'ধরাপৃষ্ঠে মুসলমানদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় একশত কোটি। তার মধ্যে প্রায় ষাট কোটি অশিক্ষিত এবং সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানহীন। তাদের অধিকাংশ কোরআনে করীম দেখেও পড়তে পারে না। ইহা সম্মানিত আলেম সমাজের জন্য চিন্তার বিষয়'

(সাপ্তাহিক সাইন্‌স্ ম্যাগাজিন ১৬ই জুন, ১৯৮৯, পৃঃ ৮)।

বস্তুতঃ আলেম সমাজের চিন্তার প্রবাহ অন্যদিকে। তারা পরস্পরকে কাফের আখ্যা দেয়া ও একে অন্যকে হত্যা করাতে ও লুট তরাজের কাজেই তৃপ্তিবোধ করে। তাদের মতে ইসলামী বিশ্বের জন্য আশংকা দজ্জালী শক্তিসমূহ থেকে নয় বরং কলেমা পাঠকারীদের পক্ষ থেকে। সে জন্য তারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রেমিকদের পিছু ধাওয়া করা এবং তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করার চিন্তায় রত থাকেন। তারা সেই আত্মোৎসর্গকারীদের নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে মত্ত, যারা সমগ্র বিশ্বে ধর্ম ও উহার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য মন, প্রাণ ও ধন -সম্পদ উৎসর্গ করে রেখেছে। পাকিস্তানের প্রখ্যাত মৌলানা ও ঐতিহাসিক রইস আহমদ জাফর বলেনঃ

"মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ভাবমূর্তি পরিষ্কার অর্থাৎ একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন, মুসলমানদের সংকটময় ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠাবোধ, সাধারণ মুসলমানের সংশোধন, সার্বিক সফলতা, কৃতকার্যতা ও স্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দর্শনে পরিতাপ ও দুঃখানুভূতি প্রকাশ ইত্যাদি। কে বা কারা তা প্রকাশ করছে? নেক কাজের আদেশদানকারী ও মন্দ কাজের নিষেধকারী, হিযবুল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারী কে বা কারা ? জামাত ও ইমামে হিন্দের লোকেরা করছে কি এ কাজ? না। তাহলে কি শেখুল হিন্দের প্রতিনিধি ও দেওবন্দে শেখুল হাদীস এ কাজ করছে? না তারাও নয়। তাহলে কারা? এরা তারাই যাদের বিরুদ্ধে স্তুপাকারে কুফরীর ফতওয়া জমা হয়েছে, যাদের অমুসলিম বানানোর কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হচ্ছে, যাদের বিশ্বাস সন্দেহযুক্ত জটিল ও বিতর্কিত বলে ঘোষিত। কবি কত সুন্দর বলেছেন ;

"সেই দক্ষ ধার্মিক দল হতে কেউ উঠলো না
যা কিছু হলো তা এই ধর্মত্যাগী তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিতদের দ্বারাই হলো"

(মুসলিম লীগের ইতিহাস বা মুহাম্মদ আলী জিন্নার জীবনী মৌলানা রইস আহমদ জাফরী, পৃঃ ৫১)।

এখন দেখা যাক ইসলামের খাদেম ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ লোকদের বিরুদ্ধে লুধিয়ানভী কি অপবাদ লাগাচ্ছেন।

আহমদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের বৈধতা

লুধিয়ানভী সাহেব আহমদী ও অন্যান্য আখ্যায়িত কাফেরদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন তার সারাংশ হলো, আহমদীদের কাফের আখ্যা দেয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জন্য কাফের নাম মেনে নেয় না এবং নিজেদেরকে মুসলমান আখ্যা দেয়ার জন্য জিদ করে। যদি এই কারণেই বিশ্বব্যাপী আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে স্মরণ রাখবেন যে, উম্মতে মুসলেমার ভিতর তেহাত্তর দল রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দল পরস্পরকে কাফের আখ্যা দেয়। কিন্তু কোন দলই নিজেদেরকে কাফের বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় বরং তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। যদি আহমদীদেরও এই অপরাধই হয়ে থাকে, তাহলে কেবলমাত্র তাদের সাথে হীন ও জঘন্য আচরণ করার কী বৈধতা আছে?

ইসলামী বিশ্বে পরস্পরকে কাফের আখ্যা দেয়ার ফেত্‌না এতই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, কোন দল বা সম্প্রদায় ইহা হতে নিস্তার পায় নি। পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুসলমান সাংবাদিক মৌলানা আবদুল মজীদ সালেক সাহেব এই বিষয়ের উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করার পর জামেউশ্‌ শাওয়াহেদের ২য় পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

"ইসলামী বিশ্ব এবং ইসলামের ইতিহাসের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং মুসলমান ভ্রাতৃত্বের প্রত্যেক দল কোন না কোন সম্প্রদায়ের তথাকথিত আলেমদের দৃষ্টিতে কাফের, ধর্মত্যাগী এবং ইসলাম বহির্ভূত। শরীয়ত এবং তরীকার জগতে কোন পথাবলম্বী বা কোন জাতি ও কুফরী ফতওয়া হতে নিষ্কৃতি পায়নি"।

(মুসলমানে কি তক্‌ফীর কা মসআলা মাওলানা আবদুল মজীদ সালেক, পৃঃ ৭-৮, নক্‌শ প্রেস লাহোর, আঞ্জুমান তাহাফ্‌ফুযে পাকিস্তান, লাহোর)

অত্যন্ত বেদনাদায়ক এই দীর্ঘ ও কষ্টকর ইতিহাসের বর্ণনা তো এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তবুও দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত কিছু ফতওয়া উপস্থাপন করা হচ্ছে, যদ্বারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিছুটা অনুধাবন করা যাবে।

বেরেলভীদের বিরুদ্ধে দেওবন্দীদের ফতওয়া ঃ

দেওবন্দী আলেম সমাজের মতে সকল বেরেলভী মুশরেক কাফের (অংশীবাদী ও অস্বীকারকারী) ; উদাহরণস্বরূপ লিখেন যে, "যে ব্যক্তি রসূল করীম (সঃ)-কে অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত বলে বিশ্বাস করে, হানাফী নেতৃবর্গের মতে সে নিশ্চিত অংশীবাদী এবং কাফের"।

(ফতওয়া রশীদিয়া কামেল মুবাওয়েব, রশীদ আহমদ গাংগোহী, পৃঃ ৬২ প্রকাশক মোঃ সাঈদ এণ্ড কোম্পানী, কুরআন মহল, মৌলভী মুসাফের খানার বিপরীতে, করাচী)

শিয়ারাও কাফের ঃ

শিয়াদের বিরুদ্ধে নামীদামী দেওবন্দী আলেম সমাজের ইহা সর্বসম্মত ফতওয়া যে ঃ

'শিয়ারা শুধু ধর্মত্যাগী, কাফের বা ইসলাম বহির্ভূতই নয় বরং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু এবং এমন শত্রু যে তদ্রূপ শত্রু অন্যান্য সম্প্রদায়ে অল্পই পাওয়া যাবে। মুসলমানদের উচিত এরূপ মানুষের সাথে সকল প্রকারের ইসলামী রীতি-নীতির সম্পর্ক বর্জন করা, বিশেষ করে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক।'

(উলামায়ে কেরাম কা মুত্তাফেকা ফতওয়া, দরবারায়ে এরতেদাদ শিয়া এসনা আসারিয়া, প্রকাশক মৌলভী মুহাম্মদ আবদুশ্ শুক্কুর লাখনৌ, সফর ১৩৪৮ হিজরী)

আহলে হাদীসগণও কাফের ঃ

'দেওবন্দের সত্তরজন আলেম দস্তখত করে আহলে হাদীসদিগকে কাফের ফত্‌ওয়া দিয়েছে এবং লিখেছে যে, তাদের সাথে মিলা-মিশা, তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং ধর্মের জন্য আশংকা ও অশান্তির কারণ' (ইশতেহার মত্‌বুয়া ইলেকট্রিক আবুল আলায়ী প্রেশ,আগ্রা)

জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতওয়া ঃ

দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে জামাতে ইসলামী সম্পর্কে এই ফতওয়া দেয়া হয়েছে যে ঃ 'এই জামাত নিজেদের পূর্বসূরী (মির্জায়ী)দের চেয়েও মুসলমানদের ধর্মের জন্য অধিক ক্ষতিকারক।

(এস্‌তেফ্‌তায়ে জরুরী, পৃঃ ৩৭, প্রকাশক মুহাম্মদ ওহীদউল্লাহ্ খান, ছাপাখানা মুর্তযা প্রেস, রামপুর, ১৩৭৫ হিজরী)

বেরেলভী আলেমদের ফতওয়াঃ

বেরেলভী আলেমরা সকল দেওবন্দী আলেমদের নাম উল্লেখ করে ফতওয়া দিয়েছে যে ঃ

'এরা নিশ্চিত কাফের, ধর্মত্যাগী, তাদের ধর্মত্যাগ ও কুফরী জঘন্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তা-ও এই ধরনের যে, যদি কোন ব্যক্তি এই ধর্মত্যাগী ও কাফেরদের ধর্মত্যাগ ও কুফরী সম্পর্কে সামান্য সন্দেহও পোষণ করে, তাহলে সে ও তাদের মতই ধর্মত্যাগী এবং কাফের।'

(পোষ্টার ওলামায়ে রেরেলভী উদ্ধৃতি দৈনিক আফাক, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫২)

দেওবন্দী ও তদ্রুপ অন্য মতাবলম্বীদের সম্পর্কে মক্কা ও মদীনার আলেমদের ফতওয়া ঃ

'তারা সবাই মুরতাদ। উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম বহির্ভূত। বিধর্মী ও কুধর্মীদের নোংরা সরদার। সকল নোংরা বিশৃংখলাকারী এবং হঠকারীর চেয়েও জঘন্য। এমন দুশ্চরিত্র যে, পথ-ভ্রষ্টতার কারণে সবচেয়ে জঘন্য কাফের প্রতীয়মান হয়। আলেম, ফকীর এবং পুণ্যবানদের বেশ ধারণ করে কিন্তু তাদের অন্তর নোংরামীতে ভরা।'

(হেসামুল হারামাইন আন মনহারিল কুফর ওয়াল মাইন, পৃঃ ৭৩ থেকে ৭৬ লেখক মৌলানা আহমদ রেযা খান, প্রেস আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, বেরেলী)

আহলে সুন্নত আলেমদের ফতওয়া ঃ

'এই যুগে ইসলামকে ওহাবী ও দেওবন্দীদের কোন কোন দল যত ক্ষতি করেছে সমস্ত বাতেল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবেও এত ক্ষতি করে নি। ....ইসলাম হতে পৃথক হয়ে যাবার পরেও এই সম্প্রদায় নিজেদের সুন্নী, হানাফী নামে পরিচয় দেয়, যার ফলে অজ্ঞ সুন্নী-হানাফী ভাইয়েরা ধোঁকা খায় এবং স্বগোত্রীয় মনে করে তাদের সাথে মেলা-মেশা বহাল রাখার কারণে তাদের ধোঁকার জালে ফেঁসে যায়।'

(ইশতেহার মোঃ ইব্রাহীম ভাগলপুরী ছাপা, বকরী প্রেস)

এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রখ্যাত আইনবিদ হিসেবে পর্যবেক্ষণ করার পর ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রতিভাবান জজ মরহুম জাসটিস মুনীর নিম্নলিখিত রায় দেন, যাহা এ বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। তিনি লিখেন ঃ

"যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, এই ব্যক্তি বা এই জামাত ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত, তাহলে "মুসলমান কাকে বলে" এই বিষয় সম্পর্কে দাবীকারকের মনে একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। মোকদ্দমার এই অংশের ফলাফল মোটেও সন্তোষজনক নয়। যদি এরূপ সাধারণ বিষয় নিয়েও আলেমদের মধ্যে এত বিভ্রান্তি থাকে, তাহলে জটিল বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদের মতপার্থক্য যে কোন্ পর্যায়ে উপনীত হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

(রিপোর্ট তাহকিকাতী আদালত, পৃঃ ২৩১ প্রকাশক হক ব্রাদার্স, আনার কলি, ইনসাফ প্রেস, লাহোর)

পরবর্তীতে অভিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী ১০টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের দেয়া সংজ্ঞা উল্লেখ করে লিখেন ঃ-

"ধর্মের কোন দুইজন আলেম এই মৌলিক বিষয় সম্পর্কে একমত নয়। যদি আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে মুসলিমের কোন সংজ্ঞা পেশ করি, যেমন প্রত্যেক আলেম করেছে এবং সেই সংজ্ঞা তাদের সংজ্ঞা হতে ভিন্নতর হয়, তাহলে আমাদেরকে সর্বসম্মতভাবে ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত সাব্যস্ত করা হবে। আর আমরা যদি আলেমদের কোন একজনের সংজ্ঞা গ্রহণ করে নেই, আমরা সেই আলেমের দৃষ্টিতে তো মুসলমান থাকবো, কিন্তু অন্য আলেমদের সংজ্ঞানুসারে কাফের সাব্যস্ত হবে" (ঐ পৃঃ ২৩৫)।

ভয়ানক ধরনের কুফরী ঃ

লুধিয়ানভী সাহেব কুফরীর তিনটি ধরন বর্ণনা করেন। সেগুলো হলো কাফের, মুনাফেক এবং যিনদীক। তিনি আহমদীদেরকে ভয়াবহতম কুফরীর বাহক আখ্যা দিয়ে যিনদীক (ভয়ানক অবিশ্বাসী) সাবস্ত্য করেন (ঐ পৃঃ ৫)।

এই কথাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের আলেমগণ দেওবন্দীদের সম্পর্কে বলেছে, যা মৌলভী সাহেবের নিজ সম্প্রদায়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, মৌলভী সাহেব যিনদীক শব্দ ব্যবহার করেছেন; একে বাজে কথা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? মনে হয় মৌলভী সাহেবের স্মরণপটে বাকী সম্প্রদায়ের ফতওয়াবলীর এই শব্দ জাগ্রত ছিল না। এজন্যই তো নতুনভাবে নিপুণতা দেখানোর প্রয়াস নিয়েছেন।

নতুবা 'যিনদীক' শব্দটি অনেক আগেই তাদেরই জন্য হারাম শরীফের আলেমগণ প্রয়োগ করে রেখেছেন। এই উদ্দেশ্যে "হিসামুল হারামাইন আলা মনহরিল কুফর ওয়াল মাইন" পুস্তকটি দেখুন। (লেখক মৌলভী আহমদ রেযা বেরলভী খান, পুস্তকের ছাপাখানা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, বেরেলী ১৩২৬ হিজরী ১৯০৮ইং)। উহার ৭৩-৭৬ পৃষ্ঠাতে কত বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে এ ফতওয়া লিপিবদ্ধ আছে। এরপর অন্ততঃপক্ষে এই ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন আপনার জন্য সমীচীন নয়।

আহমদীদের হত্যা করার ফতওয়া

আহমদীদের 'অবিশ্বাসী' আখ্যা দেয়ার পর লুধিয়ানভী সাহেব আমদীদিগকে হত্যা করার ফতওয়া দেন (পৃঃ ৮, ৯)।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, ইহা নতুন কোন ফতওয়া নয়। উম্মতের শত শত বৎসরের ইতিহাস ইহার সাক্ষী দিচ্ছে যে, বাহ্যিকতার পূজারী ইউসুফ লুধিয়ানভীর স্বগোত্রীয় মৌলভীরা বারংবার অন্যান্য ফেরকার লোকদের শুধু ধর্মত্যাগীই বলে নি, বরং হত্যাযোগ্য বলে আখ্যাও দিয়েছে। এই ফতওয়া শুধু ফেরকাগুলো পর্যন্তই সীমিত নয় বরং ইসলামের গণ্যমান্য আলেমদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ হত্যার ফতওয়া জারী করা হয়, আর তাদেরকে খুন করা বৈধ আখ্যা দেয়া হয়।

সবচেয়ে মর্মন্তুদ- বেদনাদায়ক হল কারবালার ঘটনা যার বেদনা কিয়ামত পর্যন্তও প্রশমিত হবে না, অথচ সেই ঘটনার শিকার হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করা বৈধ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে লুধিয়ানভী সাহেবের স্বগোত্রীয় কাযী শোরাইহে। ইহা প্রমাণ করে যে, তার স্বগোত্রীয় মুফতীদের আবিষ্কৃত ফতওয়া শুধু মাত্র বর্তমান যুগের সাথেই সম্পর্কিত নহে, বরং দীর্ঘ অতীত যমানার সাথেও ইহা সমভাবে সম্পর্কিত। নিম্নে আমরা দৃষ্টান্তরূপে উম্মতের কিছু পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করছি যাদের বিরুদ্ধে শুধু কুফরীর ফতওয়াই ছিল না বরং তাদেরকে ভয়ানক ধরনের অবিশ্বাসী বলে 'হত্যযোগ্য' আখ্যাও দেয়া হয়েছে।

নম্বর	নাম	মৃত্যু	উদ্ধৃতি
১.	হযরত ইমাম আবূ হানীফা	১৫০ হিজরী	আবাতীল ওহাবীয়া, পৃঃ ১৭
২.	" মুহাম্মদ আল্ ফকীহ্	১৯৩ "	মজমুল মুয়াল্লেফীন, খণ্ড ১১, পৃঃ ১৬৭
৩.	" যুননূন মিসরী	২৪৫ "	আলইওয়াকীত ওয়াল জওয়াহের, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪
৪.	" আহমদ রাওয়ান্দী	২৮৯ "	মজমুল মুয়াল্লেফীন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০০
৫.	" ইবনে হান্নান	২৯৭ "	সাপ্তাহিক খুরশীদ সনদীলা ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮
৬.	" মনসুর হাল্লাজ	৩০৯ "	কামূসুল মশাহীদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৪
৭.	" ইমাম গায্যালী	৫০৫ "	আল্ গায্যালী, পৃঃ ৫৬
৮.	" শেখ আবুল হাসান শাযলী	৬৫৪ "	আল্ ইওয়াকীত ওয়াল জওয়াহের, প্রথম খণ্ড, পৃঃ১৩০

শত শত নির্যাতিত নিষ্পেষিত আলেমদের মধ্য হতে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হলো, যাদেরকে বিশ্বাসহীনতার নামে নির্যাতনের লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কুফরীর অপবাদের বেদনা হতে কোন বুযর্গ নিস্তার পান নি।

উম্মতী নবুওয়ত কি বন্ধ?

লুধিয়ানভী সাহেব আহমদীদেরকে যিনদীক (বিশ্বাসহীন) আখ্যা দেয়ার একটা কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, আহমদীরা আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে উম্মতী নবুওয়তকে প্রবহমান মনে করে। লুধিয়ানভী সাহেব ইহা ভাল করে জানেন যে, ইহাই যদি বিশ্বাসহীনতা হয় (যিনদীকিয়ত) তাহলে এই অপরাধ সেই খোদা- প্রেমিকদেরও যারা লুধিয়ানভী সাহেবের মতে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। উম্মতের নিম্নলিখিত আলেমদের

অবস্থানও সেই সারিতেই, যারা এ বিষয় সম্পর্কে আহমদীদের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। তারা হলেন,

হযরত আল্লামা হাকীম তিরমিযী, সাইয়্যেদ আব্দুল করীম জিলানী, আল্লামা ইবনে আরাবী, আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী, আল্লামা কুম্মী, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা তূরবশতী, আল্লামা আব্দুর রহমান জামী, হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী এবং অন্যান্যরাও। দেওবন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব যে বুযর্গ এবং প্রখ্যাত আলেম এ সম্পর্কে কোন দেওবন্দীর দ্বি-মত নেই। তারই বিশ্বাস অবিকল উপস্থাপন করা হচ্ছে ঃ-

"যদি নবী করীম (সঃ)-এর যুগের পরে কোন নবী জন্মগ্রহণ করে, তাহলেও "খাতেমিয়তে মোহাম্মদীয়া" (সঃ)-তে কোন বিঘ্ন ঘটবে না" (তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা ২৮ মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব, প্রেস কাসেমী, দেওবন্দ)।

জনাব লুধিয়ানভী সাহেব! "যিন্দিকের" যে সংজ্ঞা আপনি দিয়েছেন তা তাঁর বেলায় কেন প্রযোজ্য হয় নি? আমাদের মতে এই সংজ্ঞা না তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না জামাতে আহ্‌মদীয়ার ক্ষেত্রেও। বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো আপনি যে শাখাতে বসে আছেন, অজ্ঞতাবশতঃ সেই শাখাকেই আপনি কর্তন করার চেষ্টায় রত।

হুযূর (সঃ)-এর পরে কি কোন নবী নেই?

লুধিয়ানভী সাহেব বলেন,

'হুযূর (সঃ)-এর পরে কোন নবী নেই। তাঁর পরে কাউকে নবুওয়ত দেয়া হবে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, পূর্বের কোন নবী জীবিত নেই। ধরুন, হুযূর (সঃ)-এর যুগে পূর্বের সকল নবী এসে গেল এবং হুযূর (সঃ)-এর সেবকে রূপান্তরিত হলো, তা সত্ত্বেও তিনি আখেরী নবী থাকবেন। কেননা, তাঁর পরে কাউকে নবুওয়ত দেয়া হয় নি। সম্মানিত নবীদের যে তালিকা আল্লাহ্‌তাআলার নিকট ছিল উহাতে শেষ নাম তাঁরই ছিল। তাঁর আগমনে সম্মানিত নবীদের সেই পরিপূর্ণতা লাভ করল'(পৃষ্ঠা-১০)।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, মৌলভী সাহেব নিজের বালসুলভ বক্র চিন্তাধারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। মৌলভী সাহেব এই মনে করেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের পরে কাউকে নবুওয়ত দেয়া তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। কিন্তু কোন পুরানো নবীর দ্বিতীয়বার এসে নবুওয়ত ক্রিয়াশীল করা আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী নয়।

মৌলভী সাহেবের এই ধারণা একেবারেই অজ্ঞতাপ্রসূত এবং বর্জনীয়। আঁ হযরত (সঃ)-এর শেষ নবী হওয়া যদি কেবল এই অর্থে হয় যে, তাঁর পরে নবুওয়তের পদ কাউকে দেয়া হবে না, কিন্তু নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা বাকী থাকবে, তাহলে ইহা কেমন সম্মান প্রদর্শন তা বোধগম্য নয়।

অন্য ভাষায় ইহার অর্থ হবে এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-ই শেষ ব্যক্তি যাঁকে নবুওয়তের পদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাঁর পরে নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই তাঁর "আখেরীয়তকে" অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে আল্লাহ্তাআলা একজন পূর্বের নবীকে অসাধারণ দীর্ঘ জীবন দান করবেন, যেন নূতন বা নবী সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তাই দেখা না দেয় এবং পুরাতনকে দিয়েই নূতন প্রয়োজন পূর্ণ করা যায়।

খোদাতাআলার অফুরন্ত প্রজ্ঞার প্রতি এ ধরনের হাল্কা কথা আরোপ করা লুধিয়ানভী সাহেবের দ্বারাই সম্ভব। প্রশ্ন হলো, আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে নবুওয়তের আবশ্যকতা রয়েছে কি নেই? যদি উত্তর দেয়া হয় যে, শরীয়তধারী নবুওয়তের প্রয়োজন আছে, তা হলে আহমদী বা অ-আহমদী সকলেই একবাক্যে বলবে, 'না মোটেও প্রয়োজন নেই।'

যে শরীয়ত পরিপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত অবধি যার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেই শরীয়তের আবির্ভাবের পর কোন প্রকার নূতন বিধানের আবশ্যকতা থাকে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শরীয়তবিহীন নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা বাকী আছে কি? এর উত্তর কেবল আহমদীরা নয়, লুধিয়ানভী সাহেব ও তার সমমনা সকল আলেম এই উত্তর দিতে বাধ্য যে, হাঁ, শরীয়তবিহীন নবুওয়তের আবশ্যকতা রয়েছে এবং বিপথগামী মুসলমানের সংশোধনের জন্য ও সমগ্র দুনিয়াতে ধর্মের বিজয়ের জন্য শুধু মৌলভী, পীর, ফকীরদের কাজই যথেষ্ট নয়, এই মহান কার্য সম্পাদানের জন্য খোদার কোন নবীর আগমনও আবশ্যক। এই কারণে এ বিষয়েও কোন মতভেদ নেই।

এখন বিতর্কিত বিষয় শুধু ইহা থেকে যায় যে, যিনিই আসুক এমনভাবে তিনি আসবেন যেন কোন অর্থেই তিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্যে অসম্মানের কারণ না হয়ে বরং সম্মান বৃদ্ধির কারণ হন।

মৌলভী ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব ও তার স্বগোত্রীয়দের মতে এই প্রশ্নের উত্তর হলো, 'আঁ হযরত (সঃ)-এর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তিকে নবুওয়তের পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না, তিনি যতই অনুবর্তিতা করুন না কেন। তাঁর উম্মতের এবং যুগের সংগত চাহিদাকে পুরা করার জন্য কোন পুরনো নবীকে ডাকা হোক এবং সকল কাজ তাঁর দ্বারাই সম্পাদন করা হোক।'

জামাতে আহমদীয়ার মতে এই সমাধান কেবল হাস্যকর নয় বরং তা অসম্মানজনকও এবং এতে বিরূপ ফলাফল সৃষ্টি হবে। তার পরিবর্তে সোজা, সরল এই আয়াত অনুসারে ইহাই যে ঃ

من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও এই রসূলের অনুবর্তিতা করবে তারা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের উপর আল্লাহ্তাআলা আশীষ বর্ষণ করেছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণ (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭০)।

হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত এবং তাঁর দাসদের মধ্য হতে সেই কামেল দাসকেই উম্মতী নবুওয়তের পোষাক প্রদান করা হবে, যে খোদার দৃষ্টিতে ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠিতে সর্বাধিক উপযুক্ত হবে এবং এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন উম্মতের নবীর দয়া বা মধ্যস্থতা গ্রহণ করা হবে না।

এখন প্রস্তাবিত উভয় সমাধান আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। প্রত্যেক বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই একথা বুঝতে পারেন যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রয়োজন মিটানোর জন্য পুনরায় ভিন্ন স্থান হতে কোন ভিন্ন বা পুরনো নবীর পৃথিবীতে আগমন 'খতমে নবুওয়তের' প্রকাশ্য অবমাননা এবং 'খতমে নবুওয়তের' মোহর ভাঙ্গা ছাড়া তিনি কোন মতেই উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না। কিন্তু কথা শুধু এখানেই শেষ নয়। এই পরিস্থিতিতে আঁ হযরত (সঃ)-এর উম্মতের জন্য তাঁর আগমন অত্যন্ত অবমাননাকর হবে। কেননা, এই উম্মতের শয়তানী আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এবং শয়তানী প্ররোচনার উপর বিজয় লাভের প্রয়োজন মুহূর্তে এমন কাউকেও এতটুকু যোগ্য বিবেচনা করা হয়নি খোদাতাআলা যাকে উম্মতের মধ্য হতে উম্মতী নবী বানিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সকল চাহিদা পূরণ করতে পারেন। এই কারণে মূসায়ী উম্মতের একজন নবীকে ফিরিয়ে এনে ধর্মীয় চাহিদা পুরণ করার প্রয়োজন হলো। অধিকন্তু যখন কোন নবীর প্রয়োজন বাকী রইল তখন প্রশ্ন উঠে যে, খোদতাআলা শেষ নবী পাঠিয়ে দেয়া সত্ত্বেও একজন নবীর আগমনের আবশ্যকতা বাকী রইল কেন?

একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হওয়ার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই বিশ্বাসে আঁ হযরত (সঃ)-এর মর্যাদার অবমাননা হয়। খোদাতাআলার দৃষ্টিতে যদি কোন নবুওয়তের প্রয়োজন বাকী থাকতো বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে ইহাকে অসময়ে বন্ধ করে দেয়া খোদার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার পরিপন্থী। নবী প্রেরণের প্রয়োজন সর্বকালের জন্য পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকলে সেই নবুওয়তকে প্রবহমান না রাখা খোদার প্রজ্ঞাবিরোধী কাজ হয়।

সুতরাং যখন ইহা সাব্যস্ত হল এবং আহমদীসহ সবাই এ বিষয়ের উপর একমত যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন শরীয়ত বা বিধানের প্রয়োজন নেই, তাহলে আবশ্যিক, স্বাভাবিক ও বিবেক-সম্মত শেষ কথা হবে, 'আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে মানবজাতির জন্য কোন প্রকারের শরীয়তের আবশ্যকতা বাকী থাকবে না।' কেননা, তিনি শেষ শরীয়তধারী নবী। ইহা অত্যন্ত বিবেকসম্মত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ, ইহার বিপরীত কোন কথা জ্ঞানতঃ গ্রহণযোগ্য হবে না। যাঁর বিধান পরিপূর্ণ ও সংরক্ষিত তাঁর পরে বিধান সম্বলিত কোন নবী আসার ধারণা প্রকাশ্যে মিথ্যে।

সুতরাং 'শেষ হওয়া' সাব্যস্ত হয় চাহিদার মাপকাঠিতে। অতএব কে পূর্বে জন্ম নিল এবং কে পরে, কিংবা প্রথমে কাকে নবুওয়ত দেয়া হলে, আর পরে কাকে, ইত্যাদি ধরনের বিতর্ক দ্বারা কে প্রকৃত বা শেষ নবী, সে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। যদি কাউকে পরে নবুওয়ত দেয়া হয় এবং তা' সত্ত্বেও প্রথম ব্যক্তির পুনরাগমনের প্রয়োজন বাকী থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি নবুওয়তের দিক থেকে যুগের চাহিদাকে পরে পূরণ করবে, নিঃসন্দেহে সে-ই যুগের দিক থেকে শেষ নবী।

জামাতে আহমদীয়ার মতে শুধু যুগের দিক থেকে শেষ নবী হওয়া মোটেও সম্মানের কারণ নয়; বরং যুগের দিক থেকে শেষ শরীয়তধারী হওয়াই সম্মানের কারণ। কেননা, ইহার সংগত ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, শেষ শরীয়তধারী ব্যক্তির উপর যে শরীয়ত নাযেল হয়েছে তা সর্বোৎকৃষ্ট, সবচেয়ে পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ী। এ কারণে ইহার পরে আর কোন শরীয়তের প্রয়োজন নেই। সুতরাং শেষ শরীয়তধারী নবী হওয়া অনেক বড় মর্যাদার ব্যাপার। ইহার দ্বিতীয় ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এমন নবীর শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কোন এমন নবী হতে পারেন না যিনি তাঁর নির্দেশকে রদ করবেন বা উহাকে পরিবর্ধন বা পরিবর্তন করবেন। কেননা, বিবেকের মাপকাঠি দ্বারা এ কথা বোধগম্য হয় যে, যাঁর বিধান সর্বকালের জন্য হবে তাঁর আদেশ প্রদানও চিরকাল অব্যাহত থাকবে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে শেষ (নবী) হওয়া অবশ্যই মর্যাদার কারণ। আহমদীয়া জামাতের বিশ্বাস ইহাই। কিন্তু লুধিয়ানভী সাহেব ও তার স্বগোত্রীয়েরা মনে করেন যে, শুধু যুগের দিক থেকে শেষ হওয়া মর্যাদার কারণ। অথচ এই অর্থহীন বিশ্বাসের মাপকাঠিতে বিচার করলে যুগের দিক থেকে ঈসা (আঃ) ই শেষ নবী হবেন। কেননা, যদিও তাঁকে পূর্বেই নবুওয়ত দেয়া হয়েছে, তবুও আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে প্রয়োজনে যে শেষ ব্যক্তি দুনিয়াতে নবুওয়ত পরিচালনা করবেন তিনি ঈসা আলায়হেস সালাম হবেন।

শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কে হবেন?

লুধিয়ানভী সাহেব বলেন,

"যদি কোন বাচ্চাকে পিতামাতার শেষ সন্তান বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, সে নিজের পিতামাতার ঘরে সকল সন্তানের পরে জন্মগ্রহণ করেছে। তার পরে তার পিতামাতার ঘরে কোন বাচ্চা জন্ম নেয় নি। শেষ সন্তান হওয়া অর্থ এই নয় যে, সে সকল সন্তানের মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকবে। কোন সময়ে এমনও হয়ে থাকে যে, জন্ম পরে হয় কিন্তু মৃত্যু প্রথমে হয় তা' সত্ত্বেও তাকে শেষ সন্তান বলা হয়ে থাকে। আপনি হয়ত বলতে শুনে থাকবেন যে, আমার শেষ সন্তান সেই বাচ্চা ছিল, যে মৃত্যুবরণ করেছে" (ঐ পৃঃ ১০-১১)।

পরে জন্ম গ্রহণকারী বাচ্চার উদাহরণ দিয়ে লুধিয়ানভী সাহেব 'শেষ' এবং 'প্রথমের' যে তুলনা পেশ করেছেন তা কয়েকভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সেজন্য দৃষ্টান্তের শুধু এক অংশ নিয়ে চূড়ান্ত দাবী করে বসা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পদবী সম্পর্কিত বিষয়ে

আলোচনা করতে হলে এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে,পদধারীদের মধ্যে 'শেষ' তাকে আখ্যা দেয়া হয়, যে, নিজের পদ নিয়ে জীবিত থাকে; এই বিতর্ক উত্থাপিত হয় না যে, সে কবে জন্ম নিয়েছে। যদি বলা হয় যে, মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ ছিলেন, তাহলে যে ঐতিহাসিক জন্ম তারিখের সন্ধান করতে গিয়ে তার শেষ হওয়ার সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখে সে পাগল বলেই গণ্য হবে। পদাবলম্বীদের বেলায়ও ঠিক তাই। শেষ হাকীম, শেষ চিকিৎসক, শেষ চিন্তাবিদ, শেষ তফসীরকারক সকলেই স্বীয় মৃত্যু তারিখ হিসেবেই শেষ সাব্যস্ত হন, জন্ম তারিখ হিসেবে নয়।

লুধিয়ানভী সাহেব আরও একটি মারাত্মক ভুল করছেন যে, তিনি শুধু শেষের তর্ককেই আঁকড়িয়ে বসে আছেন। কিন্তু আসল প্রসংগটা কি তা দেখছেন না। আমরা তো শুধু শেষ হওয়াকে মোটেও সম্মান এবং মর্যাদার প্রতীক মনে করি না। সুতরাং আলোচনাধীন উদাহরণকে এমন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত যাতে কোন কোন অর্থে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু, তাঁর জন্য সম্মান এবং মহত্বের কারণ হয় এবং কোন কোন অর্থে তার উল্টোটা হয় তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। অস্পষ্ট দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করার পরিবর্তে আপনি বরং সোজাসুজি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আপনাদের এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা করে দেখে নিন। যারা সামান্য ন্যায়-বিচারও করতে পারেন তারা উপলব্ধি করবেন যে, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমারা উপস্থাপন করি তা আপনাদের বালসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক বেশী সম্মান, মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের বাহক।

আপনারা এই বলে থাকেন যে, ঈসা (আঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেন, অনেক পূর্বে নবুওয়তের পদে অধিষ্ঠিত হন, অনেক পরে মৃত্যুবরণ করবেন এবং তিনিই শেষ নবী যাঁকে পৃথিবী নবুওয়তের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নবুওয়তের দায়িত্বে পালন করতে দেখবে এবং তিনি হযরত ঈসা (আঃ) হবেন। যদি "প্রথম" এবং "শেষের" শুধু শাব্দিক অর্থ করা হয় যা নিয়ে আপনারা "জিদ" করছেন, তাহলে (উপরোক্ত) এই অর্থই হয় এবং পৃথিবীর কোন মানুষ একে পরিবর্তন করতে পারে না।

আমাদের ধারণা এই যে, শুধু যুগের দিক থেকে শেষ হওয়া বা প্রথম হওয়া যদি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়, তাহলে ইহা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মর্যাদার প্রকাশ্য অবমাননা। অধিকন্তু পদের দিক থেকে ও জন্মের দিক থেকে অন্য সকল নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অগ্রজ। হযরত ঈসা (আঃ)-এর তো (নাউযুবিল্লাহ্) দ্বিগুণ প্রাধান্য হলো, কারণ তিনি প্রথমে আসলেন এবং পরে মৃত্যুবরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে নবুওয়ত দেয়া হলো, আর সর্বশেষে যিনি নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করলেন তিনি ঐ ব্যক্তিই হলেন। শুধু ইহাই নহে। আঁ হযরত (সঃ) তো নিজের উম্মত-উম্মতে মুহাম্মদীয়ারই নবী ছিলেন, অথচ ঈসা (আঃ) অদ্ভুত সম্মান পেলেন যে, তিনি মূসায়ী উম্মতের নবীও ছিলেন আবার উম্মতে মুহাম্মদীয়ারও নবী হবেন-এইরূপ বিশ্বাস হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্য আরো অবমাননার বিষয়।

আঁ হযরত (সঃ) সম্পর্কে আমরা ইহাই বিশ্বাস রাখি যে, একমাত্র তিনিই এমন ব্যক্তিত্ব যাঁকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এই বিশ্বজনীনতায় কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। এতদ্ব্যতীত আমরা আরো বিশ্বাস রাখি যে, দাস হিসাবে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি এই বিশ্বজনীন পয়গামকে সমগ্র পৃথিবীতে পৌছানোর দায়িত্বে তাঁর (সঃ) প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত। কিন্তু ইহা আপনার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, ঈসা (আঃ) এই ব্যাপারে শুধু তাঁর (সঃ) সমকক্ষই নয় বরং দ্বিগুণ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

رسولا الى بنى اسرائيل ও তিনিই ছিলেন। আর

رسولا الى المسلمين والناس اجمعين ও তিনিই হবেন।

(অর্থাৎ তিনি বনী ইসরাইলের প্রতিও প্রেরিত, অনুরূপভাবে মুসলমান তথা সমগ্র জাতির প্রতিও প্রেরিত হয়েছেন-অনুবাদক)। সুতরাং তিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে প্রথমও থাকতে দিলেন না এবং শেষেও থাকতে দিলেন না। আল্লাহ্তাআলাকে কিছুটা ভয় করুন! বিবেক দিয়ে কাজ করুন। এ ধরনের বিশ্বাস লালন করে আল্লাহ্কে কীভাবে মুখ দেখাবেন? জামাতে আহমদীয়া যেহেতু যুগের দিক থেকে প্রথম হওয়া বা শেষ হওয়াকে কোন গুরুত্ব দেয় না, বরং প্রথম হওয়া এবং শেষ হওয়াকে মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দেয়, সেজন্য আহমদীয়া জামাতের বিশ্বাসের উপর কোন যুক্তিযুক্ত আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। ১,২৪,০০০ নবী কোন ব্যাপারই নয়, যদি কোটি কোটি নবী যুগের দিকে থেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর পূর্বে আসতেন তবুও তাঁর 'প্রথম' হওয়ার উপর কোন প্রকার প্রভাব পড়তো না। কেননা, মর্যাদার এবং শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে খোদার সমীপে তিনিই প্রথম ছিলেন আর তিনিই শেষ থাকবেন। অনুরূপভাবে এই সকল নবী যুগের দিক থেকে তাঁর পরে আসলেও যেহেতু তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক, সেজন্য তার শেষ হওয়াটা প্রভাবিত হয় না এবং তিনিই "খাতাম" থাকতেন। দেখুন, স্বয়ং আপনার নিজেরই এই বিশ্বাস যে, ঈসা (আঃ) পরে পুনঃ আগমন করা সত্ত্বেও খাতামিয়তের মোহর চূর্ণকারী সাব্যস্ত হবেন না, বরং তাঁর দাসত্বের গণ্ডিতে প্রবেশ করবেন। সুতরাং এই বিতর্কে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও বিবেকবানের নিকট এই তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'প্রথম হওয়া' এবং 'শেষ হওয়া' মর্যাদা ও পদবীর দিক থেকে প্রশংসার যোগ্য, শুধু যুগের দিক থেকেই নয়।

যদি জনাব মৌলভী সাহেবের মাথায় একথা এখন পর্যন্ত না ঢুকে থাকে, তাহলে অন্য একটি উপমা দিয়ে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করছি ঃ

মানুষের মধ্যে কোন একজন অবশ্যই প্রথম মানব ছিল। জনাব লুধিয়ানভী সাহেবের বিশ্বাস কি এই যে, যুগের দিক থেকে যে- ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি ছিল সে-ই মর্যাদার দিক থেকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল? অনুরূপভাবে যখন কেয়ামত হবে তখন কোন মানুষ বা কিছু মানুষ অবশ্যই এমন হবেন যারা সবার শেষে এই পৃথিবীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। সেজন্য মানুষ হিসেবে যুগের দিক থেকে তারা শেষ মানুষ বলে আখ্যায়িত হবেন। তাদের

শেষে মৃত্যুবরণ করায় জনাব লুধিয়ানভী সাহেবের মতে কি তারা পূর্বে অতিবাহিত সমগ্র মানবজাতি থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে? কখনই না, বরং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের অবহিত করছেন যে, কিয়ামত اشرار الناس (অর্থাৎ সবচেয়ে দুষ্ট) লোকদের উপর আসবে। এ হাদীসে স্পষ্ট ধারণা দেয় যে, যারা এ পৃথিবীতে সর্বশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে তারা অধিকাংশই অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং দুষ্ট হবে। জনাব লুধিয়ানভী সাহেব এখন বলেন, শুধু যুগের দিক থেকে শেষ হওয়া আপনার মতে কি এখনও সম্মানের কারণ?

তাছাড়া মর্যাদা এবং পদবীর বিষয়ে কখনও জন্ম ও মৃত্যুকে বিবেচনা করা হয় না। যেমন ঃ বনু উমাইয়ার শেষ খলীফা ছিলেন দ্বিতীয় মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান। লুধিয়ানভী সাহেব বা তার কোন স্বগোত্রীয় মৌলভী, যে আরবী জানার দাবী রাখে, সে কি মারওয়ানকে বনু উমাইয়া রাজত্বের খাতামুল খোলাফা বা শ্রেষ্ঠ খলীফা ও শেষ খলীফা সাব্যস্ত করতে পারে? অনুরূপভাবে বনু আব্বাস আমলের মু'তাসিম বিল্লাহ্‌কে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি খাতামুল খোলাফা আখ্যা দিতে পারে? কখনই নয়। কেননা, "খাতাম" শব্দ মর্যাদা, পদবী ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে এবং উচ্চতার দিক থেকে সর্বশেষ মর্যদায় অধিষ্ঠিত হওয়াকেই বুঝায়। অন্যথায় আপনার কৃত অর্থে যদি এ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহলে কেয়ামত নিকৃষ্ট লোকদের উপর আসা উচিত নয়, বরং সমগ্র আদম সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের উপর আসা উচিত। এবং তাদেরকেই মানব জাতির "খাতাম" আখ্যা দেয়া উচিত।

মৌলভী সাহেব আরেকটি উপমা দেখুন ঃ যেখানে সাহাবাদের বা খলীফাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ থাকে সেখানে আপনাদের এই বিতর্ক উত্থাপন করা উচিত ছিল যে, প্রথম কে ছিলেন? হযরত আলী (রাঃ), না হযরত আবূ বকর (রাঃ) ? এছাড়া যখন সাহাবাদের প্রশংসার কথা উত্থাপিত হয়, তখন আজ পর্যন্ত এই কথা কেউ পড়ে নি বা শুনে নি যে, কোন্ সাহাবীকে শেষ ও মহান আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং বিবেক ব্যবহার করুন, হুশ ও জ্ঞানের দৃষ্টি উন্মুক্ত করুন এবং নিজের পীর ও মুরশেদ দেওবন্দ এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা কাশেম নানুতবী সাহেবের প্রজ্ঞাপূর্ণ দলীলকে পুনঃ পুনঃ পড়বার এবং চিন্তা করার চেষ্টা করুন। তিনি বলেন ঃ

"সাধারণের মতে রসূলে করীম (সঃ)-এর "খাতাম" হওয়া এই অর্থে যে, তাঁর যুগ অতীতের নবীদের যুগের পরে এবং তিনি সকলের শেষের নবী। কিন্তু বুদ্ধিমানদের জন্য ইহা স্পষ্ট যে, যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম বা শেষে হওয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কোন অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় প্রশংসার স্থলে

ولكن رسول الله وخاتم النبيين

এই কথা বলা কীরূপে সঠিক হতে পারে? হাঁ, যদি এই গুণকে প্রশংসনীয় গুণাবলী না বলেন এবং এই মর্যাদাকে প্রশংসা হিসাবে আখ্যা না দেন তাহলে অবশ্য "খাতামিয়ত"

এর অর্থ যুগগত দিক থেকে 'শেষ হওয়া' সঠিকও হতে পারে; কিন্তু আমার মতে ইসলামের অনুসারী কেউ একথা পসন্দ করবে না"।

(তাহযীরুন নাস, পৃঃ ৩, মৌঃ কাসেম সাহেব দেওবন্দ)।

মৌলভী সাহেব ইহাও স্মরণ রাখবেন যে, নানুতবী সাহেব লিখেছেন "ইসলামের কেউ একথা সহ্য করবে না।" মৌলভী সাহেব, নিজের পীর ও মুরশেদকে মান্য করুন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মান ও সম্মান প্রদর্শনের যে বিশ্বাস জামাতে আহমদীয়া লালন করে তা অবলম্বনে নিজের পরিণামকে সুন্দর করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মোহরে নবুওয়তের প্রভাব

লুধিয়ানভী সাহেব বলেন ঃ-

"কাদিয়ানীরা বলে যে, খাতামান্নবীঈন এর অর্থ এই নয় যে, তিনি শেষ নবী, ইহাও নহে যে, তাঁর পর নবুওয়তের দ্বার বন্ধ বরং অর্থ হলো এই যে, ভবিষ্যতে হুযূর (সঃ)-এর মোহরের মাধ্যমে নবী হবে।"

কথা হলো এই যে, আহমদীদের দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করেছেন জনাব লুধিয়ানভী সাহেব এবং তিনি তা' করছেন নিজের নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে। যদি তার মধ্যে বিন্দুমাত্র খোদা-ভীতির চিহ্নও অবশিষ্ট থাকতো তাহলে তিনি বলতে বাধ্য হতেন যে, আহমদীগণ খাতামান্নবীঈন এর অর্থ হুবহু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত হাদীসানুসারেই বর্ণনা করে থাকে ঃ- قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبى بعده

অর্থাৎ, হে মানুষ, ইহা অবশ্যই বলবে যে, আঁ হযরত (সঃ) খাতামান্নবীঈন। কিন্তু ইহা বলবে না যে, তাঁর পরে কোন নবী হবে না।

(দুররে মনসুর, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪, আল্লামা জালাল উদ্দীন সাইয়ুতী)

অর্থাৎ তাদের মতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই মতবাদ সম্পূর্ণ সঠিক অর্থাৎ খাতামান্নবীঈন-এর অর্থ এই নয় যে, মোটের উপর কোন প্রকারের নবীই আসবে না বরং খাতামান্নবীঈন নিজের সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নবী হবেন। যুগের দিক থেকে শেষ হওয়া দ্বারা কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না।

যদি লুধিয়ানভী সাহেবের দৃষ্টি হযরত আয়েশার (রাঃ) এই সম্মানিত বাণীর উপর না পড়ে থাকে তাহলেও অতি সহজে আহমদীদের দৃষ্টিভঙ্গি তার পীর ও মুরশেদের ভাষায় বর্ণনা করতে পারতেন এবং লিখতে বাধ্য হতেন যে, 'আহ্মদীদের বিশ্বাস তা-ই,যা মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেবের।' এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সৎ সাহস দেখিয়ে তিনি যত ইচ্ছা আক্রমণ করতেন।

যদি নিজের শিক্ষকের উপর আক্রমণ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন, বা নিজের স্বগোত্রীয় অন্যান্য মৌলভীদেরকে ভয় করেন, তাহলে ভারতবর্ষের ইমাম, দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভীর ভাষায় এই কথা লিখে দিতেন তাহলে

বিষয়টি সবার জন্য স্পষ্ট হয়ে যেত। যথা ঃ-

ختم به النبيون اى لايوجد بعده من يامره الله سبحانه بالتشريع على الناس *

সকল নবীদের "খাতাম"

লুধিয়ানভী সাহেব বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন "হুযুর (সঃ) নবীদের পরোয়ানাতে (আদেশ নামাতে) মোহর লাগিয়ে নবী বানান। প্রথমে নবুওয়ত খোদাতাআলা স্বয়ং প্রদান করতেন, কিন্তু এখন এই বিভাগ আল্লাহ্তাআলা হুযুর (সঃ)-কে সোপর্দ করে দিয়েছেন, যেন হুযুর (সঃ) মোহর লাগান এবং নবী বানান।"

লুধিয়ানভী সাহেব স্মরণ রাখেন যে, আঁ হযরত (সঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك

অর্থাৎ "হে যাবের! আল্লাহ্ সকল কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন" (মওয়াহেবুল্লুদুন্নিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯ আল্লামা কসতলানী)।

সুতরাং আমরা বিশ্বাস রাখি যে, পূর্বের নবীরাও রসূলে করীম (সঃ)-এর আশীষের কারণে নবুওয়ত পেয়েছেন এবং পরবর্তীতেও সকল জ্যোতিঃ তাঁর দ্বার থেকে বিতরণ করা হবে।

জনাব মৌলভী সাহেব, আহমদীয়তের উপর আক্রমণ করার এমন একটা উম্মাদনা আপনার মধ্যে রয়েছে এবং এরূপ বর্বরতা আপনার মাথায় চড়াও হয়েছে যে, আপনি ইহাও চিন্তা করে দেখছেন না-আপনার এই উম্মাদনায় আপনি হযরত খাতামান্নবীঈন (সঃ)-এর প্রতি প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে অপরাধী হতে চলেছেন। কে আপনাকে এই নির্জলা মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে যে, আহমদীরা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আঁ হযরত (সঃ) শুধু পরবর্তীতে আগমনকারীগণের পরোয়ানায় খাতাম (মোহর) ছিলেন? আহমদীগণের অবিচল ও দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আঁ হযরত (সঃ) সকল পূর্ববর্তীগণের খাতাম ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

এখন আপনার লেখা দ্বারা আমারা জানতে পারছি যে, আপনি আমাদের ইহাই শিখাতে চান যে, "রসূল করীম (সঃ) পূর্ববর্তীদের জন্যও খাতাম ছিলেন না এবং পরবর্তীদের

* আঁ হযরত (সঃ)-এর খাতামান্নবীঈন হওয়ার অর্থ হলো এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে না যাকে আল্লাহ্তাআলা মানবজাতির জন্য শরীয়ত সহাকারে প্রত্যাদিষ্ট করবেন অর্থাৎ নূতন শরীয়তসম্পন্ন কোন নবীর আগমন হবে না।

(আখারীন) জন্যও খাতাম হতে পারেন না।" আপনি 'খাতাম' শব্দকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকলেন। স্মরণ রাখবেন, কুরআন করীম যেহেতু আঁ হযরত (সঃ)-কে খাতামান্নবীঈন আখ্যা দেয় সেজন্য নবী নামের এমন একজনও বাকি থাকে না, যার উপর তাঁর খাতামিয়তের মোহর থাকবে না। অতএব ইহা আপনার নির্জলা মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস এবং একান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত কথা যে, নবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র নবীদের উপর যেন খাতামিয়ত এর কোন প্রভাবই ছিল না।

সত্য কথা এই যে, "খাতাম" এর অর্থ শুধু "শ্রেষ্ঠ" হওয়াই নয় বরং এর অর্থ সত্যায়নকারীও। আর মোহরের অর্থ এই নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ) ডাকঘরের মোহরের মত ছিলেন। যদিও আপনার মত ইদানিং কালের মৌলভীদের চিন্তাধারা এইরূপই। প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুয়তের চিহ্নকে "খাতাম" উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ আঁ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বের হোক বা পরের হোক, কোন নবীর মধ্যে মুহাম্মদী নবুওয়তের পরিপন্থী কোন চিহ্ন থাকলে, সে নবী কোন অবস্থাতেই আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্যায়ন অর্জন করতে পারবে না। হ্যাঁ, যার উপর মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়তের প্রতিচ্ছায়া পড়বে সে যত ক্ষীণ হোক বা পূর্ণ দেদীপ্যমান হোক, যোগ্যতানুসারে সে আঁ হযরত (সঃ)-এর দ্বারা সত্যায়িত হিসেবে পরিগণিত হবে। এই সকল অর্থের দিক থেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর "খাতাম" হওয়া যুগের সীমা থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তাঁর পূর্বে অতিবাহিত ঐ সকর নবীও যাদের উপর তাঁর মোহরের ছাপ পড়ে তারা সত্য নবী হিসাবে পরিগণিত হয়। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এ বিশ্বাসকেই সমর্থন করে ঃ

انى عبدالله فى ام الكتاب لخاتم النبيين وان ادم
لمنجدل فى طينته

অর্থাৎ ঃ- "অবশ্যই সেই সময়ও আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং খাতামান্নবীঈন ছিলাম যখন আদমকে সৃষ্টির জন্য মাটির দ্বারা খামির প্রস্তুত হচ্ছিল।" (মুসনদ আহমদ বিল হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ১২৮ আল্ মকতুবাতিল ইসলামিয়া লিত্বাবায়াতে ওয়ান্‌নশ্‌রে, বৈরুত)

মৌলভী সাহেব, আমরা আর একবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আহমদীদের আকীদা বর্ণনা কালে আপনার নিজস্ব দুর্বল ভাষা ব্যবহার না করে বরং আপনার পূর্ববর্তী বুযর্গদের বর্ণিত সেইকথা সোজাসুজি বর্ণনা করা উচিত ছিল, যা তারা আহমদীদের আকীদা সম্পর্কে অধিক বিশ্বস্ততার সাথেই পেশ করছেন। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় না করেও আপনি বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে এই কথা লিখতে পারতেন যে, "আহমদীদের বিশ্বাস হুবহু উহাই যাহা আমাদের বুযর্গ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী সাহেবের "তরজমাতুল কুরআন"-এর অনুবাদের নোটে বর্ণিত রয়েছে," যেমন ঃ

"এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি যে, তিনি (সঃ) মর্যাদা ও যুগ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে খাতামান্নবীঈন। যারা নবুওয়ত পেয়েছেন তারা তাঁর মোহরের ছাপ লাগিয়েই পেয়েছেন"

(আয়াত খাতামান্নবীঈন, প্রকাশক পাক কুরআন পাবলিশারস্, লাহোর, পৃঃ ৫৫০)।

ইহা ছাড়া যদি আপনি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতেন তাহলে ইহাও লিখতে পারতেন যে, "আহমদীদের বিশ্বাস আমরা উপরোক্ত দুইজন বুযর্গের 'তর্জমাতুল কুরআনের নোট থেকে বর্ণনা করে দিয়েছি ; কিন্তু আমাদের কিছু বুযর্গ তো তাদের চেয়েও দুই কদম এগিয়ে রয়েছেন এবং তারা এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, যোগ্যতাসম্পন্ন যে ব্যক্তি সামনে এসেছে, সে নবীতে পরিগণিত হয়েছে।" আরও দেখুন, দারুল উলুম দেওবন্দ এর ব্যবস্থাপক আমাদের বুযর্গ মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব বলেছেন, "হুযূর (সঃ)-এর মর্যাদা কেবল নবুওয়ত প্রাপ্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নবুওয়ত জারীকরণের মাঝেও নিহিত। নবুওয়তের যোগ্যতাসম্পন্ন যে ব্যক্তিই তাঁর সত্তায় আত্মবিলীন হয়েছে সে নবীতে রূপান্তরিত হয়েছে।"

(আফতাবে নবুওয়ত, পৃঃ ৮১ লেখক মৌলানা ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব প্রকাশক-এদারায়ে ইসলামিয়ত লাহোর, আশরাফ ব্রাদার্স, প্রথম মুদ্রণ ১৯৮০ –ছাপাখানা আফাক প্রেস, লাহোর)

মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর নবুওয়ত

লুধিয়ানভী সাহেব খোদাতাআলার আধিপাত্যে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে বলেন ঃ-

"কাদিয়ানীদের এই অধিকার কে দিয়েছে যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী ও রসূল মানবে এবং একই সাথে মুসলমান হওয়ারও দাবী করবে?" (ঐ পৃঃ ১৩)।

মৌলভী সাহেব, যদি এই অধিকার কাদিয়ানীদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা খোদাতাআলাই দিয়ে থাকেন। কোন মৌলভী এই অধিকার দেয়ার মালিক নয়। আপনি আশ্বস্ত থাকুন, এই অধিকার মোটেও আপনি দেন নি। যে খোদা মানব জাতির সকলকে তাঁর প্রেরিতদের গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছেন, সেই খোদাই আমাদেরকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও যুগের মাহ্দীর সকল দাবীর উপর উম্মতী নবী হিসেবে ঈমান আনার অধিকার দিয়েছেন। মৌলভী সাহেব, আপনি নিজে চিন্তা করুন এবং বলুন, আপনি কি এই বিশ্বাস রাখেন না যে, নবী (সঃ)-এর মৃত্যুর শত শত বৎসর পর ঈসা (আঃ) যখন পূর্বের দেহ নিয়ে উম্মতের মধ্যে অবতরণ করবেন তখন আপনি নবী হিসাবেই তাকে বিশ্বাস করবেন, এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে মুসলমান সাব্যস্ত করা নিয়েই জিদ করবেন। এই কথা বলার পূর্বে যদি ঐ সমস্ত লেখার উপর একটু দৃষ্টিপাত করতেন তাহলে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হতে বিরত থাকতেন। দেখুন, হযরত মুহিউদ্দীন ইব্নে আরাবী কি বলেন ঃ-

عیسی علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع وھو نبی بلاشك

অর্থাৎ ঃ- "ঈসা (আঃ) শরীয়ত বিহীনভাবে আমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারী হিসাবে আসবেন এবং তিনি নিঃসন্দেহে নবী হবেন।" (ফতুহাতে মক্কিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫ ছাপাখানা দারুল কেতাবাল আরবীয়াতুল কোবরা, মিশর)

আর প্রখ্যাত মুফতী ও দেওবন্দ-এর ফাযেল মৌলভী মুহাম্মদ শফী সাহেব লিখেনঃ–

"যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার করে সে কাফের। এই ফতওয়া ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পরেও বলবৎ থাকবে। তিনি পরে আগমন করলেও তাকে নবী ও রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা অবশ্য কর্তব্য। এবং যখন তিনি এই উম্মতে ইমাম হিসেবে আগমন করবেন তখন তাঁর নির্দেশাবলীর অনুবর্তিতা করাও একান্ত কর্তব্য। এক কথায় হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আদি থেকে যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল তা সে সময়ও প্রচলিত থাকবে" (রেজিষ্টার্ড ফতওয়া আল্‌ফ, পৃঃ ৪৯)।

এখন আপনার ভাষায় আপনাকেই প্রশ্ন করি যে, ধরে নিন ঈসা (আঃ) আপনার জীবদ্দশায় আগমন করলেন এবং আপনি তাকে নবী উল্লাহ্ বলে স্বীকৃতি দিলেন। তাহলে আপনাকে মুসলমান হওয়ার অধিকার কে দেবে? যে সত্তা আপনাকে এই অধিকার দেবেন তিনিই আমাদেরকে এই অধিকার দিয়েছেন।

আমরা একটা বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জন্য স্পষ্ট করতে বারংবার চেষ্টা করছি। হতে পারে যে, এর মধ্যে থেকে কোন একটা কথা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হেদায়াতের সকল পথ বন্ধ না-ও হতে পারে, বরং কোন কোন কথা আপনার অন্তরে স্থান পাবে।এখন ভিন্ন একটা উপায়ে এই কথা আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ঃ

স্মরণ রাখবেন, যদি কোন ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যার আগমনের শুভসংবাদ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দিয়েছিলেন। তাহলে যেহেতু মসীহ্ নবীও হবেন সেহেতু তার নবী হওয়ার দাবী কেবল তার সত্যতার স্বপক্ষেই প্রমাণ হতে পারে। মসীহ্ দাবীর সাথে নবী দাবী না থাকলে হাদীসের কষ্টিপাথরে সে দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবে।তিনি সকল প্রকারের নবুওয়তকে অস্বীকার করলে তা তাঁর নিজেরই মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ হবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আঁ হযরত (সঃ)-এর বাণী একবার নয়, চার চারবার তাকে 'নবীউল্লাহ্' শব্দে সম্বোধন করেছেন। এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তি যদি এই দাবী করে যে, আমি সেই ব্যক্তিই, কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী নই; তাহলে কি তিনি নিশ্চিত মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবেন না? কেননা, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাকে 'নবীউল্লাহ্' বলা হয়েছে কিন্তু তিনি বলতে থাকবেন যে, আমি ভবিষ্যদ্বাণীর (সত্যায়ন) পরিপূর্ণকারী বটে, কিন্তু নবী নই।

তাই আহমদীরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে মসীহ্ মাওউদ মানার সাথে সাথে নবীও মেনে নিয়েছে। ইহার অধিকার তাদের আঁ হযরত (সঃ) দিয়েছেন।ইহা থেকে বিমুখ হওয়ার কোন উপায় তাদের নেই।

সুতরাং যাকে আঁ হযরত (সঃ) শেষ যুগে আবির্ভাবকারী মসীহে মাওউদ নবীউল্লাহ্ হিসাবে সাব্যস্ত করার অধিকার দেন, তার থেকে 'মুসলমান হওয়ার অধিকার' কে হরণ করতে পারে? আপনার তো কোন মতেই এই অধিকার নেই। আপনার নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে কথা বলা উচিত। আমরা আশংকা করছি যে, এই কথা তো আপনার

মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীয়ার খোদাপ্রেমিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা এ কথাকে শুধু বুঝেন নি, বরং তারা ইহাও ব্যক্ত করেছেন যে, মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস এবং আহ্মদীদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেখুন, বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ আলেম মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী মরহুম কত পরিষ্কার কথা বলছেন। খোদা তাঁকে সরল কথার জন্য প্রতিদানে ভূষিত করুন। তিনি বলেন ঃ-

"মরহুম মির্যা সাহেব যদি নিজেকে নবী বলেন তাহলে তা এই অর্থে সঠিক হতে পারে যে, সকল মুসলমান একজন আগমনকারী মসীহের অপেক্ষায় আছে এবং এই কথা খতমে নবুওয়তেরও পরিপন্থী নয়। সুতরাং যদি আহমদীয়ত উহাই হয়, যা সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হযরত মির্যা সাহেবের লেখা থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে উহাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা যুলুম" (আল্ ফযল ২১ শে মার্চ, ১৯২৫ইং)।

মাওলানা নিয়ায ফতেহপুরী সিলসিলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ-

"সবচেয়ে বড় অপবাদ তার উপর এই আরোপ করা হয় যে, তিনি খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিলেন না। অথচ ইহা হতে অবাঞ্ছিত ও অর্থহীন অপবাদ আর হতেই পারে না। তিনি নিশ্চিতভাবে খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মধ্যে যথাসম্ভব সেই গভীর ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বাস ছিল যা একজন প্রকৃত রসূল-প্রেমিকের মধ্যে থাকা উচিত।"

(মুলাহেযাতে নিয়ায ফতেহপুরী, পৃঃ ১১৩, 'নিগার লাখনৌ' মে ১৯৬২ইং-সংকলনে মুহাম্মদ আজমল শাহেদ প্রকাশক ঃ- জামাতে আহমদীয়া, করাচী)

পুনরায় বলেনঃ-

"তিনি নিজেকে নিশ্চিতভাবে নবী (সঃ)-এর ছায়া বা প্রতিশ্রুত মাহদী মনে করেন। তার ইহা বলা "খতমে নবুওয়তে"বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কেননা, সেই নবুওয়তকে তিনি আখেরী নবুওয়ত মনে করেন। তিনি কখনও নিজে আখেরী নুবওয়তের দাবী করেন নি এবং তিনি যে নবুওয়তের প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিফলনের কথা উল্লেখ করেন তা নূতন কিছু নয়।"

(মুলাহেযাতে নিয়ায ফতেহপুরী পৃঃ ২৯ লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত নিগার পত্রিকার উদ্ধৃতি হতে নভেম্বর, ১৯৫৯, সংকলনে মুহাম্মদ আজমল শাহেদ, প্রকাশক ঃ- জামাতে আহমদীয়া, করাচী)

"অন্তর্যামী মৌলভী সাহেব"

লুধিয়ানভী সাহেব আহমদীদের উপর একটা অপবাদ ইহাও লাগিয়েছেন যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কলেমাকে রহিত করে মির্যা গোলাম আহমদের কলেমাকে পৃথিবীতে চালু করেছে।

আবার এ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টাও করছেন যে, জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা যখন 'কালেমা তাইয়্যেবা' পড়ে বা লিখে তখন মুখে মুহাম্মদ (সঃ) উচ্চারণ থাকে এবং অন্তরে থাকে মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)।

লুধিয়ানভী সাহেব,হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর উম্মতী নবী হওয়া সম্পর্কে আপনার আপত্তি রয়েছে এবং আপনার এত দুঃসাহস যে, খোদার ভয় তো করছেনই না, উল্টা নিজেই খোদা হয়ে গেছেন। অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার দাবী তো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও করেন নি। আর আপনার এত বড় স্পর্ধা যে, অদৃশ্যের সম্যক জ্ঞানী সেজে বসে আছেন এবং সকল আহমদীদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষী বনে বসেছেন। তাদের অন্তরে কথা বর্ণনা করার অধিকার যেন তাদের চেয়ে আপনার বেশী রয়েছে। ইহার প্রকৃত এবং সত্যিকারের উত্তর তো কুরআনের ভাষায় এরূপ রয়েছে ঃ

لعنت الله على الكاذبين

(অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত)। যদি মিথ্যাবাদী খোদাতাআলার অভিসম্পাতের শাস্তি পায় তাহলে এমন মিথ্যাবাদী সবচেয়ে জঘন্য অভিসম্পাতে দণ্ডিত হবে, যে খোদাতাআলার অংশীদার হওয়ার দাবী করে। একজন আহমদীর অন্তরে গোপন ফন্দীর কোন্ কথা লুক্কায়িত আছে তা আপনি জ্ঞাত আছেন। আমরা জানি একমাত্র খোদাই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আপনিও সেই অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করে খোদার জ্ঞানের অংশীদার হয়েছেন। জনাব লুধিয়ানভী সাহেব, সাধারণ সাহাবীর মোকাবেলায় আপনার কোন মর্যাদা নেই বললেই চলে। স্মরণ রাখবেন, এক বার রসূল করীম (সঃ)-এর একজন বুযর্গ সাহাবী যখন এক ব্যক্তি সম্পর্কে এই মন্তব্য করলেন যে, ঐ ব্যক্তি মুখে যা বলতেন অন্তরে তিনি বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন (এই মন্তব্যটি শুধু এক ব্যক্তি সম্পর্কেই ছিল, কোন জামাত সম্পর্কে নয়)। তখন আঁ হযরত (সঃ) সেই সাহাবীর উপর এত ক্রোধান্বিত হন যে, সাহাবী সারা জীবন নিজের এই ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা ও দুঃখ ব্যক্ত করতে থাকেন। কিন্তু আপনি এমন এক ব্যক্তি, যে শুধু একজনের উপর নয় বরং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ আহমদীর উপর অপবাদ লাগানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন যে, তারা যখন কলেমা শাহাদত পড়তে গিয়ে মুহাম্মদ (সঃ) নাম উচ্চারণ করেন তখন অন্তরে আহ্‌মদ নাম জপেন। সুতরাং আপনি এমন এক জঘন্য অপরাধ করছেন যা প্রকৃত পক্ষে উল্লেখিত সাহাবীর ভ্রান্তির মোকাবেলায় কয়েক লক্ষ গুণ বেশী ঘৃণ্য। একটু চিন্তার সাথে নিম্নলিখিত হাদীসটি পড়ুন এবং এই পরিষ্কার আয়নার সাহায্যে নিজের ঘৃণ্য অবস্থার ছবিটি দেখার চেষ্টা করুন। আপনি তো সমগ্র পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীর অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু অবগত হওয়ার দাবীদার, কখনও স্বীয় অন্তরে উঁকি মেরে দেখেছেন কি? যদি না দেখে থাকেন তাহলে দেখুন হাদীসে লেখা রয়েছে, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ

"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فصبحنا الحرقات - من جهينة فأدركت رجلا - فقال : لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك - فذكرته النبى صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقال : لا إله إلا الله و قتلته ؟" قال قلت يارسول الله ! إنما قالها خوفا من السلاح قال "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا" فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى اسلمت يومئذ" -

অর্থাৎ "রসূলে করীম (সঃ) আমাদেরকে এক যুদ্ধে পাঠান। আমরা সকাল বেলা জহিনা এলাকার হারাকাত গ্রামে পৌছলাম। সেখানে এক ব্যক্তির সাথে আমার হাতাহাতি হয়। যখন তাকে কাবু করে ফেল্লাম, সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে নিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাকে বর্শা মেরে হত্যা করলাম। এই ব্যাপারে আমার অন্তরে যন্ত্রণাবোধ হচ্ছিল, যা আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে উল্লেখ করি। তখন হযূর (সঃ) বল্লেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?' উত্তরে আমি বল্লাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! সে তো শুধু অস্ত্রের ভয়ে এই কথা বলছিল।' এই কথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, 'সে এই কথা অন্তর থেকে বলেছে কি বলে নি তা তুমি কীভাবে জানতে পারলে? তুমি তার অন্তর চিরে দেখেছ? হযরত উসামা (রাঃ) বলেন যে. এ কথাকে রসূল করীম (সঃ) আফসোস ও দুঃখের সাথে এতবার পুনরাবৃত্তি করেন যে, আমার বাসনা হল, "হায় যদি আমি সেইদিন পর্যন্ত মুসলমানই না হতাম"। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান, বাব তাহরীমু কত্লীল কাফেরে বা'দা কওলেহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)।

আমি একজন আহমদী মুসলমান, আহমদীদের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করেছি এবং আহমদীদের মধ্যে জওয়ান হয়ে এই দৃঢ়তার সম্যক অবগত যে খোদা, আমি তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রম এর কসম খেয়ে বলছি যে, আজ পর্যন্ত কলেমায়ে শাহাদত পড়ার সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রসূলুল্লাহ্ হওয়ার সাক্ষী দিয়েছি, একবারও মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্থানে মির্যা গোলাম আহমদের নাম অন্তরে জাগ্রত হয় নি। বরং জিহবা ও অন্তরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামই ছিল। যদি আমি এই বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হই তাহলে দুনিয়া ও পরকালের উভয়স্থলে আমার উপর খোদার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। অন্য আহমদীকে ছেড়ে দিন শুধু আমার ব্যাপারে কসম খেয়ে বলুন, "আহমদী কি সত্যিকার মুসলমান নয়" বইয়ের লেখক অধম এ, এস, মুসা সম্পর্কে আমি ইউসুফ লুধিয়ানভী অদৃশ্য ও দৃশ্যের সম্যক

জ্ঞানী এই ঘোষণা করছি যে, এ, এস, মুসা প্রত্যেকবার কলেমা পাঠ করার সময় 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)' পড়ার পরিবর্তে 'মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' নাম জপে। আর যদি আমি মিথ্যা কসম খাই তাহলে আমার উপর সহস্রবার খোদাতাআলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

দেখুন লুধীয়ানভী সাহেব, আমরা পরিষ্কার ফয়সালা করে দিয়েছি। আপনি কসম খেয়ে দেখান। কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের স্বপক্ষে প্রমাণ প্রকাশ করতে থাকবেন। কিন্তু আপনার কসমের পরে আপনার সাথে আমাদের তর্কের অবসান ঘটবে। আর খোদার বিচারালয়ে যখন মামলা উঠবে তখন তিনি নিজেই দেখবেন এবং নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

যদি আমাদের কসমের চ্যালেঞ্জের প্রতি উত্তরে লুধিয়ানভী সাহেব এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, এই কথাটি তো মির্যা বশীর আহমদ সাহেরব লেখা থেকে উপস্থাপন করেছেন, তাহলে প্রথমতঃ ইহা দেখা উচিত যে, এই লেখার পটভূমিকা কী? কী কী অর্থে তিনি ইহা লিখেছেন? যদি তিনি লিখেন যে, যেহেতু মুহাম্মদ নাম সকল নবীর সম্মিলনস্থল সেজন্য মুহাম্মদ নামের মাঝে সকল নবীর সত্যায়ন নিহিত রয়েছে; সে নবী পূর্বের হোন বা পরের হোন তাতে কোন কিছু যায় আসে না। ইহা এমন একটি বিষয় যার উপর সকল খোদাভক্ত মুসলমান ঈমান রাখে। ইহার অর্থ মোটেও এই নয় যে, কেউ মুহাম্মাদ (সঃ) নাম পাঠ করার সময় ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ) বা অন্য কোন নবীকে চিন্তায় স্থান দেয়। অনুরূপভাবে যখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ বিষয়টি লিখেন তখন ইহার অর্থ আদৌ এই নয় যে, যখন তিনি বিষয়টি পাঠ করতেন তখন তার অন্তরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবর্তে অন্য কারো নাম উদয় হতো। ইহা বলা আপনার মত শুধু নামধারী মোল্লাদেরকেই সাজে, যারা আধ্যাত্মিক কথাকে অনুধাবন করা ছাড়াই অন্যের লেখার উপর দুঃসাহসিকতার সাথে আক্রমণ করে।

স্মরণ রাখবেন, এই বই লেখার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আহমদীয়ত পৃথিবীর ১২৪টি দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে (বর্তমানে ১৬০টির অধিক দেশে-প্রকাশক)। আর দুনিয়ার ১২৪টি দেশের অধিবাসীরা আপনার এই দাবীর উপর অভিশাপ দেয় এবং এই বিশ্বাস করে যে, সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত আহমদীদের মধ্যে একজনও (নাউযুবিল্লাহ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ধারণা করার মত নোংরা কাজ করে না। সুতরাং আপনি সেই লেখা উপস্থাপন করতে গিয়ে সরাসরি যুলুমের পন্থা অবলম্বন করে ঐ লেখার ভাবার্থের পরিপন্থী কথা বলছেন। কিন্তু ইহা হতেও বড় যুলুম এই যে, এক ব্যক্তির লেখা সম্পর্কে সমগ্র দুনিয়ার আহমদীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই লেখার এরূপ অর্থ তাদের প্রতি আরোপ করছেন,যা আপনার নিজের বানানো, তাই হয়ত ইহা আপনার অজ্ঞতার সমষ্টি বা মিথ্যার সমষ্টি বা উভয়ের খামিরের সমষ্টি।

এখন শুনুন, আহমদীদের উপর আক্রমণ করার অদৌ আপনার কোন অধিকার ছিল না। কেননা, আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নন। কিন্তু আপনি দৃশ্যের জ্ঞানও তো রাখেন না; তা না হলে আপনি আপনার একজন অত্যন্ত বুযর্গ ব্যক্তির এই সাক্ষ্যের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টিপাত করতেন ঃ

اشرف علی رسول اللہ

(আশরাফ আলী রসূলুল্লাহ্)

(রেসালা, আল ইমদাদ ৮ সফর হিঃ সন ১৩৩৬, ৩৪-৩৫ পৃঃ মৌলানা আশরাফ আলী, ছাপাখানা ইমদাদুল মোত্তাবেয়ে থানাভূন)

এখন বলুন, এখানে কলেমা গোপনভাবে নয় অতি স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ইহা আপনার দৃষ্টির অগোচরে কেন থাকল? কেন আপনি ইহার পর দেওবন্দী ধর্ম থেকে তওবা করে বেরেলভী ধর্ম অবলম্বন করেন না? যারা আপনার মতই আক্রমণে অভ্যস্ত তারা শুধু এক ব্যক্তির দায়িত্বহীন লেখার কারণে সমস্ত দেওবন্দীদের মুশরেক সাব্যস্ত করে রেখেছে এবং প্রকাশ্যভাবে এই ঘোষণা করছে যে, 'দেখ! দেওবন্দীদের কলেমা মুসলমানদের কলেমা পড়ে তখন মনে মনে আশরাফ আলী থানবী সাহেবের নাম জপে।' এখন বলুন, আপনার বেরেলভী হয়ে যাওয়া ছাড়া মুসলমান নাম রাখার কোন অধিকার বাকী থাকে কি?

লুধিয়ানভী সাহেব, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের যে উদ্ধৃতির উপর নিজের মিথ্যার ভিত রেখেছেন তা হ'ল এই, "মসীহে মাওউদ (আঃ) নিজেই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ), যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার আগমন করেছেন। সে জন্য আমাদের নূতন কোন কলেমার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্থলে অন্য কেউ আসতো তা হলে আবশ্যকতা দেখা দিত" (কলেমাতুল ফসল ঃ পৃঃ ১৫৮)।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই অংশটি প্রকৃতপক্ষে এমন এক আপত্তিকারীর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে যিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে, আহমদীদের ভিন্ন কোন কলেমা নেই, অথচ এ পন্থায় অতি ধূর্ততার সাথে আহমদীদের 'ইলমে কালাম' এর উপর তার আক্রমণ করার উদ্দেশ্য ছিল আহমদীদের এইভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যে, যদি মির্যা সাহেবের ভিন্ন কোন কলেমা না থাকে তাহলে তিনি কোন ভাবেই নবী সাব্যস্ত হতে পারেন না এবং যদি ভিন্ন কলেমা থাকে তা হলে আহমদীদেরকে উম্মতে মুহাম্মদীয়া থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

ধূর্ততার জাল থেকে বাঁচার প্রয়াশে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই স্তবকটি লেখেন-যার উপর জনাব লুধিয়ানভী সাহেব নির্মমভাব আক্রমণ করেছেন। ইহার যে উত্তর "কলেমাতুল ফসল" বইয়ে লেখক দিতে চেয়েছেন তা-ই আজ সকল আহমদীদের উত্তর, যা হ'ল, "জামাতে আহমদীয়ার কোন ভিন্ন কলেমা নেই। কিন্তু মৌলভী সাহেব যে বলেন, 'জামাতে আহমদীয়ার ভিন্ন কলেমা আছে'-ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জামাতে আহমদীয়ার কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)।" আমরা হযরত মির্যা সাহেবকে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মোকাবলোয় মোটেও স্বাধীন নবী হিসাবে স্বীকার করি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দাস

ও অনুগামীকে যদি উম্মতী নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয় তাহলেও নতুন কলেমার কোন আবশ্যকতাই দেখা যায় না। কেননা, মুহাম্মদ (সঃ)-এর কলেমাই কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী ও শক্তিশালী হয়ে আছে।

আপত্তিকারীকে এ কথা বুঝাতে গিয়ে "কলেমাতুল ফসল" গ্রন্থের লেখক এ পন্থাও অবলম্বন করেন যে, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর পদ এতই মহান যে, ইহা শুধু অতীতের উপরই প্রাধান্য লাভ করেনি, বরং ভবিষ্যতের উপরও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। কিন্তু যেমন করে এ কথা বলা সঠিক হবে যে, সকল নবীদের নাম, যেমন আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ), প্রমুখ মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের অধীন এবং এ কলেমার অন্তর্ভুক্ত, অনুরূপভাবে ইহা বলাও ঠিক হবে যে, পরবর্তীতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দ্বারা আশিসমণ্ডিত হয়ে কেউ যদি উম্মতী নবুওয়তের মর্যাদা পায় তাহলে উহাও মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাখ্যা শুধু বিবেচনাসম্মত কোন কথা নয় বরং বাস্তবভিত্তিক যার উপর সেই বাহ্যদর্শী মৌলভীদের দৃষ্টি নেই। অন্য নবীদের সত্যায়ন তা তার পূর্বের হোক বা পরের হোক মুহাম্মদ (সঃ) নামের সত্যায়নের মধ্যে এ জন্য অন্তর্ভুক্ত হয় যে, কুরআন করীম এমন একটি কিতাব যা অন্য সকল নবীর সত্যায়নকে ঈমানের ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর ইসলাম সেই ধর্ম যা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয করেছে যে, "যদি তুমি খোদাতাআলার অন্যান্য নবীদের কোন একজনের অস্বীকারকারী হও তাহলে শুধু মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর ঈমান যথেষ্ট হবে না।"

সুতরাং ইহা মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহান অনুগ্রহ যে, তিনি অন্যান্য সকল নবীর সত্যায়নকারী হলেন- সে নবী দুনিয়ার যে কোন স্থানে বা যে কোন যুগেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন। ইহা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা, যা বর্ণনা করতে গিয়ে "কলেমাতুল ফসল" বইয়ের লেখক আপত্তিকারীকে এই কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের প্রভু ও মওলা (অভিভাবক) হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এমন মর্যাদা রয়েছে যে, তাঁর নামে সকল নবীর সত্যায়ন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু ইহাই যে, তোমরা শুধু অতীতের নবীদের সত্যায়নই এই নামের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। আর আমরা সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী ইমাম মাহদী (আঃ)-কেও এই সত্যায়নের অন্তর্ভুক্ত মনে করি, যাঁকে আমরা উম্মতী নবীর মর্যাদা দিয়ে থাকি।

সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ)-এর কলেমা পাঠকারীদের জন্য অন্য কোন কলেমা পড়ার দরকার নেই। কেননা, সকল কলেমা মুহাম্মদ (সঃ)-এর কলেমাতে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীকে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে স্বীকৃতিদাতাদের জন্য ইব্রাহীম রসূলুল্লাহ্, মূসা রসূলুল্লাহ্, ঈসা রসূলুল্লাহ্ বা অন্য কোন নবীর কলেমা পড়ার আবশ্যকতা নেই। অনুরূপভাবে আহমদীদের জন্যও মোটেই আবশ্যক নেই যে, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালেমা পড়ার পর তারা আহমদ রসূলুল্লাহ্‌র কলেমা পড়া আরম্ভ করবে।

ইহা সেই অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ কথা ছিল, যা বুঝানোর জন্য "কলেমাতুল ফসল" গ্রন্থের লেখক হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রাঃ) চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি এ কথা চিন্তা করেন নি যে, তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু মোটা বুদ্ধির লোক রয়েছে, যারা কেবল পরিষ্কার মনোবৃত্তি নিয়ে এ কথা বুঝে না তা নয়, বরং কেবল আপত্তি করার উদ্দেশ্যেই আপত্তি করে থাকে। সত্য সন্ধান করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। এই লুধিয়ানভী সাহেবও সেই লোকদের মধ্যে প্রথম সারির একজন।

মৌলভী সাহেব! যে কথা আমরা বুঝিয়েছি তা বুঝেন এবং তওবা করেন। কেননা, এই বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস-ভিত্তিক। আর ইহাই আয়াতে খাতামান্নবীঈনের অর্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ যে, মুহাম্মদ (সঃ) সকল নবীর সত্যায়নকারী হয়েছেন। সুতরাং যে তাঁর সত্যায়ন করল সে যেন সমগ্র নবীদের সত্যায়ন করল, তা সেই নবীর পূর্বেরই হোক বা পরেরই হোক।

এ ব্যাখ্যার পরও যদি এই মৌলভী শত্রুতার বশবর্তী হয়ে অবৈধ আর অসঙ্গত আক্রমণ প্রত্যাহার না করেন, তাহলে তাকে আর আমাদের কিন্তু বলার নেই। তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে।

সুতরাং এমতাবস্থায় শেষ কথা এই হবে যে, অবশ্যই আহমদীদের অন্য কোন কলেমা নেই। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও ইহা স্বীকার করে।

এই কারণে আহ্‌মদীদের নূতন কলেমার প্রয়োজন নেই যে, আমরা বিশ্বাস করি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কলেমাতে সমগ্র নবীদের সত্যায়ন অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু লুধিয়ানভী সাহেব যেহেতু এই বিশ্বাসকে খোদাহীনতার বিশ্বাস বলে মনে করেন, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তার বুযর্গ এবং মোর্শেদ নিজের পৃথক একটি কলেমা বানিয়ে নিয়েছেন এবং তার অনুসরণকারীদেরও 'আশরাফ আলী রসূলুল্লাহ্' বলে শ্লোগান দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

"কলেমাতুল ফসল" বইয়ের ঐ লেখা সম্পর্কে যাকে মৌলভী সাহেব অত্যন্ত ভয়ানক কুফরী কলেমা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, আমরা তা পাঠকবৃন্দের জন্য খোলসা করে দিতে চাই। লুধিয়ানভী সাহেব এই লেখার যে অর্থ করতে চেয়েছেন তা সরাসরি যুলুম ও অপবাদ। আর তা এ পর্যায়ের যুলুম ও অপবাদ হবে যেমন কোন ব্যক্তি উম্মতের ঐ সকল বুযর্গদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের লেখা ও উক্তি থেকে কুফরী ও খোদাহীনতার অর্থ আবিষ্কার করে, যাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি ঃ

কুরআন করীম ও নবী (সঃ)-এর হাদীসের আলোকে উম্মতে আবির্ভাবকারী ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) নিজের কেতাব "আল্ খায়রুল কাসীর"-এ লেখেন,

حق له أن ينعكس فيه انوار سيد المرسلين صلى الله عليه و سلم ويزعم العامة انه إذا نزل فى الارض كان واحدا من الامة - كلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدى و نسخة منتسخة منه فشتان بينه و بين أحد من الامة -

অর্থাৎ "আগত প্রতিশ্রুত ব্যক্তির মধ্যে রসূলদের সর্দার (সঃ)-এর জ্যোতির প্রতিফলন ঘটার যোগ্যতা রয়েছে। সাধারণ মানুষ এ ধারণা করে যে, যখন সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি পৃথিবীতে আগমন করবেন তাঁর মর্যাদা শুধু একজন উম্মতী হবে। কিন্তু এমনটা মোটেও ঠিক নয়। বরং তিনি তো সম্পূর্ণ নাম মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হবেন এবং তাঁরই আরেকটি সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি হবেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে এবং একজন সাধারণ উম্মতের মধ্যে অনেক বড় ব্যবধান রয়েছে।"

[আল্ খায়রুল কাসীর, পৃঃ ৭৩, মদীনা প্রেস, বিজনূর, হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রাঃ)]

পুনরায় শরাহ্ ফসূসুল হাকাম এ ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে লেখা রয়েছে যে,

"المهدى الذى يجيئ فى اخرالزمان فانه يكون فى احكام الشريعة تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم و فى المعارف والعلوم والحقيقة تكون جميع الانبياء والاولياء تابعين له كلهم ولاينا قض ماذكرناه لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه وسلم" -

অর্থাৎ-"শেষ যুগে যে ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করবেন তিনি শরীয়তের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুগামী হবেন এবং জ্ঞান-তত্ত্বে সমস্ত নবী ও আওলিয়া তাঁর অনুগামী হবেন। এই কথা আমাদের উল্লিখিত কথার পরিপন্থী নয়। কেননা, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অন্তর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অন্তর হবে।"

(শরাহ্ ফসুসূল হাকাম, প্রেস মুস্তাফা আল্বাবী আল্হালবী, পৃঃ ৪২, ৪৩ ইমাম আবদুর রাজ্জাক কাশানী)।

আবার একাদশ শতাব্দীর শিয়া মুয্তাহেদ আল্লামা বাকের মজলিসি নিজের বই "বিহারুল আনওয়ারে" লেখেন যে, হযরত ইমাম বাকের (রহঃ) বলেছেন-

"يقول (المهدى) يامعشر الخلائق ألا ومن أراد ان ينظر إلى ابراهيم واسمعيل - فها أنذا ابرهيم و اسمعيل ألاومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع - فها أنذا موسى يوشع - ألا ومن أراد أن ينظر إى محمد و امير المؤمنين- (صلوات الله عليه) فها أنذا محمد صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين" -

অর্থাৎ-ইমাম "মাহদী (আঃ) এসে ঘোষণা করবেন যে, হে মানব! যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দর্শন লাভ করতে চাও তাহলে শুন, আমিই ইব্রহীম ও ইসমাঈল (আঃ)। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেহ মূসা ও ঈসাকে দেখতে চাও তাহলেও শুন, আমিই মূসা ও ঈসা এবং যদি তোমাদের মধ্যে কেহ মুহাম্মদ (সঃ) ও আমীরুল মু'মিনীন (আলী রাঃ)-কে দেখতে চাও তাহলেও শুন, আমিই মুহাম্মদ (সঃ) এবং আমীরুল মু'মিনীন"। (বিহারুল আনোয়ার, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ২০২)

কিন্তু যখন হযরত মির্যা সাহেব মাহদী হওয়ার দাবী করতে গিয়ে পূর্ববর্ণিত সেই সকল সংবাদ অনুসারে নিজের পদমর্যাদা বর্ণনা করেন তখন লুধিয়ানভী সাহেবের দৃষ্টিতে এ কথা আপত্তির কারণ হয়ে যায়। হায়! যদি লুধিয়ানভী সাহেব আপত্তি করার পূর্বে হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)-এর এই বক্তব্যটা পড়ে নিতেন।

আবার আরেফে রব্বানী এবং খোদা-প্রেমিক হযরত সৈয়দ আব্দুল করীম জিলানী (রহঃ) বলেন, তাঁহার (ইমাম মাহদী-আঃ এর- লেখক) দ্বারা ঐ ব্যক্তিকেই বুঝায় যিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর পদমর্যাদার অধিকারী এবং যিনি সকল প্রশংসনীয় উচ্চতায় পরিপূর্ণ ভারসাম্যতা রাখেন।" [ইনসানুল কামেল (উর্দু) বাব-৬১, মাহদী (আঃ)-এর বর্ণনা, পৃঃ ৩৭৫ নফীস একাডেমী, করাচী]

আবার হযরত খাজা গোলাম ফরীদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে খাতামুল বেলায়েত ইমাম মাহদী (আঃ) পর্যন্ত সকলের মাঝেই হুযূর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রকাশিত হয়েছেন। প্রথমবার হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে প্রকাশিত হন.....। ইহার পর অন্যান্য মহান মাশায়েখদের মধ্যে পালাক্রমে প্রকাশিত হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। এমনকি ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মধ্যেও প্রকাশিত হবেন।

সুতরাং হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) পর্যন্ত যত নবী, ওলী, কুতুব অতিবাহিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)-এর আত্মার প্রকাশস্থল।

(মাকাবীসুল মাজালিস, পৃঃ ৪১১-এরশাদাত হযরত খাজা গোলাম ফরীদ (রহঃ) সংকলনে-মুহাম্মদ রুকনউদ্দীন, প্রকাশকবৃন্দ, ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন-১৯৭৯)

নতুন শরীয়ত প্রবর্তনের মিথ্যা অপবাদ

লুধিয়ানভী সাহেব আহমদীদের উপরে নতুন এক পৃথক শরীয়ত (বিধান) প্রবর্তন এবং মুসলমানদের কাফের আখ্যা দেয়ার অপবাদ লাগিয়েছেন।

অথচ এই অপবাদও বাকী অপবাদগুলোর মতই সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক, যার সাথে জামাতে আহমদীয়ার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। দুনিয়ার ১২৬টি দেশে (বর্তমানে ১৬০টিরও অধিক দেশে –প্রকাশক) আহমদীরা সুপ্রসারিত।
কোন একটি স্থানেও এই অপবাদ আরোপিত হতে পারে নি যে, তাদের শরীয়ত পৃথক। শুধু পাকিস্তানেই হতভাগা মৌলভীরা গায়ের জোরে পৃথক শরীয়ত প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। সেখানে মৌলভীরা দিন-রাত্র এই শয়তানী কাজে মশগুল যাতে আহমদীরা মুহাম্মদী শরীয়তের উপর আমল করতে না পারে। কিন্তু সকল আহমদীরা অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের প্রভু ও মওলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়তকে পরিপূর্ণ নিবিড়তার সাথে ধরে রেখেছে। আর এই কারণেই শত শত আহমদীকে জেলে দেয়া হয়েছে, মারপিট করা হয়েছে, চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের জীবন নাশের জন্য আক্রমণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে, এমন কি কতককে শহীদও করা হয়েছে। কারণ ইহাই যে, মৌলভীদের দুঃখ যে, এরা কেন মুহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়তের ওপর আমল করে। যদি আহমদীদের শরীয়ত পৃথক হয়ে থাকে তাহলে পাকিস্তানে এই আইন বানানোর কী প্রয়োজন ছিল যে, আহমদীরা যেন মুহাম্মদী শরীয়তের ওপর আমল না করে?

মৌলভীদের এই অপবাদের উদ্দেশ্য শুধু অশান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই মৌলভী নিজেই জানে যে, আহমদীরা অন্য কোন শরীয়তের উপর আমল করে না। আজকের মোল্লা তো নিজের আখেরাত নষ্ট করে ফেলেছে। তাই আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আবদেন করছি, তারা যেন তাদের ইসলাম পরিপন্থী কথাগুলির অনুসরণে তাদের নিজেদের আখেরাত নষ্ট না করেন। হযরত মির্যা সাহেব জামাতে আহমদীয়ার যে আকীদার (ধর্ম-বিশ্বাসের) বর্ণনা করেন তা পাঠ করলে মোল্লার আক্রমণাত্মক আপবাদের রহস্য আপনা হতেই উন্মোচিত হয়ে যায়। হযরত মির্যা সাহেব বলেনঃ-

(১) আমরা তো বলি যে, সেই ব্যক্তি কাফের, যে আঁ হযরত (সঃ)-এর শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক করে। আমাদের মতে আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুবর্তিতা থেকে যে ব্যক্তি বিমুখ হয় সে-ই যদি কাফের হয়, তাহলে যে-ব্যক্তি নতুন শরীয়ত আনার দাবী করে বা কুরআন ও সুন্নতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে বা কোন আদেশকে রহিত মনে করে তার অবস্থা কী হবে? আমাদের মতে মু'মিন তো সে-ই, যে কুরআন করীমের সত্যিকার অনুসরণ করে এবং কুরআন শরীফকেই খাতামুল কুতুব হিসাবে বিশ্বাস করে এবং সেই শরীয়তকেই চিরস্থায়ী মনে করে, যা আঁ হযরত (সঃ) দুনিয়াতে এনেছেন। আর যে ইহাতে এক বিন্দু-বিসর্গও পরিবর্তন করে না এবং ইহার অনুবর্তিতায় নিবেদিত

হয়ে নিজেকে বিলীন করে দেয়, নিজের অস্তিত্বের এক এক বিন্দু, এক এক কণা তাঁরই পথে উৎসর্গ করে, আমল এবং জ্ঞানের দিক থেকে সেই শরীয়তের বিরোধিতা করে-না, সে-ই খাঁটি মুসলমান হয় (আল্ হাকাম ৬ই মে, ১৯০১, পৃঃ ৫)।

(২) আমি সকল মুসলমানদের এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি কোন একটা আদেশেও অন্যান্য মুসলমান থেকে পৃথক নই। যেভাবে সকল ইসলামপন্থী কুরআনের স্পষ্ট আদেশাবলী, সঠিক হাদীস এবং মুজতাহেদদের সর্বজনস্বীকৃত কিয়াসকে অবশ্যই করণীয় মনে করে, অনুরূপভাবে আমিও মনে করি।

(আল্ হক লুধিয়ানা, পৃঃ ৮০, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৪র্থ, পৃঃ ৮০)

(৩) যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশত আদেশের মধ্য থেকে একটি ছোট আদেশকেও উপেক্ষা করে সে মুক্তির দ্বার নিজের জন্য নিজ হাতে বন্ধ করে। প্রকৃত পরিপূর্ণ মুক্তির পথ কুরআনই উন্মোচিত করেছে। বাকী সব কিছু ইহারই প্রতিচ্ছায়া ছিল, সুতরাং তোমরা কুরআনকে মনোযোগ সহাকরে পড়, আর ইহাকে ভালবাস, এমন ভালবাসা দাও যেমন তোমরা অন্য কাউকে দাও নি। (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২৪)

(৪) তোমাদের সকল সফলতা আর মুক্তির উৎস কুরআনেই নিহিত আছে। তোমাদের এমন কোন ধর্মীয় চাহিদা নেই যা কুরআন পূরণ করতে পারে না। কিয়ামতের দিন কুরআনই হবে তোমাদের ঈমানের সত্যায়নকারী বা মিথ্যার প্রকাশকারী। আর কুরআন ছাড়া দুনিয়াতে এমন কোন পুস্তক নেই যা কুরআনের মাধ্যম ছাড়া তোমাদেরকে হেদায়াত দিতে পারে। আল্লাহ্তাআলা তোমাদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনের মত পুস্তক তোমাদেরকে উপহার দিয়েছেন

(কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১৯ ,পৃঃ ২৬)।

(৫) আমি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কসম খাচ্ছি যে, আমি কাফের নই। لا اله الا الله محمد رسول الله আমার বিশ্বাস। আঁ হযরত (সঃ) সম্বন্ধে ولكن رسول الله وخاتم النبيين এর উপর আমি বিশ্বাসী। আমি আমার এ উক্তির সত্যতা সম্পর্কে ততবার কসম খেতে পারি, যে পরিমাণ খোদাতাআলার নাম রয়েছে, কুরআনের হরফ রয়েছে এবং খোদাতাআলার দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর যে পরিমাণ গুণাবলী রয়েছে। আমার কোন বিশ্বাস খোদা ও তাঁর রসূলের কথার পরিপন্থী নয়। আর যদি কেউ এমন ধারণা করে থাকে তাহলে উহা তার ভুল ধারণা এবং যে ব্যক্তি এখনও আমাকে কাফের মনে করে এবং কাফের আখ্যা দেয়া হতে বিরত হয় না, তাঁর অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে,মৃত্যুর পর তাকে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ্ জাল্লা শানহুর কসম খেয়ে আমি বলছি যে, খোদা ও তাঁর রসূলের উপর আমার এমন অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, যদি ইদানিং কালের সমস্ত ঈমানকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর আমার ঈমান অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে আল্লাহ্তাআলার ফযলে এই পাল্লাই ভারী হবে।

(কেরামাতুস সাদেকীন, পৃঃ ২৫ রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭)

অন্যান্য মুসলমানদিগকে কাফের আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রেও মৌলভী লুধিয়ানভী সাহেব প্রকাশ্য অসাধুতর পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন যে, তিনি অন্যান্য সকল ফেরকাকে মুসলমান মনে করেন কিন্তু আহমদীরা তাদেরকে অমুসলমান মনে করে। নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা হতে আপনারা ধারণা করতে পারবেন যে, জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত লেখার কারণে আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলো হতে অনেকগুণ বেশী আক্রমাণাত্মকভাবে অন্যান্যদেরকে অন্যেরা কাফের আখ্যা দিয়েছে। এই দিক থেকে এই তলোয়ার, যা মৌলভী সাহেব উঠিয়েছেন, তা সর্বপ্রথম তার উপরেই চলা উচিত যে বেশী চরমপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অন্যান্য ফেরকার নেতাদের যে সমস্ত উক্তি দেয়া হ'ল তার মধ্যে তারা তো কোন কিছুই বাদ রাখে নি। অন্যান্য ফেরকার মুসলমানদের কাফের আর মোশরেক আখ্যা দেয়া তো মামুলি ব্যাপার। এমন কি তাদেরকে জানোয়ার থেকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করতেও কার্পণ্য করা হয় নি এবং তাদের হারামী আখ্যা না দেয়া পর্যন্ত তারা শান্তিও পায় নি। এ প্রসঙ্গে বেরেলভীদের কথা ভাবেন। তাদের সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমরা শরীয়তের এই আদেশ শুনান যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত মনে করে এবং অন্য কারও জ্ঞান আল্লাহ্‌তাআলার সমান মনে করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের আর তার ইমামত, তার সাথে মিলামিশা,প্রেম-ভালবাসা সব কিছু হারাম।"

(ফতওয়া রশীদিয়া কামেল, বাব- মৌলভী রশীদ আহমদ গংগোহী পৃঃ ৬২ প্রকাশক মোহাঃ সাঈদ এণ্ড সন্‌স কিতাব ব্যবসায়ী, কুরআন মহল মৌলভী মুসাফেরখানার বিপরীতে, করাচী ১৮৮৩-৮৪)

তাদের সম্পর্কে প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম জনাব সৈয়্যদ আহসান আহমদ সাহেব মাদানী, দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক প্রধান শিক্ষক আমাদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছেন যে-

"দাজ্জাল বেরেলভী এবং তাদের অনুসারীদেরকে 'ধ্বংস হউক' বলে রসূল মকবুল (সঃ) হওজে মরুদ ও শাফায়াত হতে কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত করে প্রত্যাখান করবেন। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মতের প্রতিদান, সওয়াব, মর্যাদা এবং আশীষ হতে (তাদেরকে) বঞ্চিত করা হবে।"

(রজুমুল মুয্‌নেবীন আলা রউসুশ্‌শায়তীন আশ্‌শেহাবুস সাকেব আলা মুসতারেকিল কাযেব, পৃঃ ১১১-প্রকাশক কুতুব খানা এযাযিয়া দেওবন্দ, সাহারনপূর)

পারভেজীদের সম্বন্ধে ওলী হাসান টোনকী এবং মুহাম্মদ ইউসুফ বানোরী সাহেব সম্মিলিতভাবে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, "গোলাম আহমদ পারভেজ মুহাম্মদী শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের ও ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত। তার নিকাহ্-এর বন্ধনে না কোন মুসলমান থাকতে পারে, না কোন মুসলমান মহিলার সাথে তার নিকাহ্ হতে পারে, না তার জানাযা পড়া হবে, না মুসলমানদের কবরে কবরস্থ করা বৈধ হবে এবং এই ফতওয়া শুধু

পারভেজীদের জন্যই নয়, বরং সকল কাফেরের জন্য। তার অনুগামীদের মধ্য থেকে যে এই কুফরী বিশ্বাসে বিশ্বাসী তার উপরও একই ফতওয়া প্রযোজ্য এবং যেহেতু সে ধর্মান্তরিত প্রমাণিত হ'ল, সেহেতু তার সাথে কোন ইসলামী সম্পর্ক রাখা শরীয়তগত দিক থেকে বৈধ নয়।"

(ওলী হাসান টোনকী গাফরুল্লাহ্ মুফতী ও মুদাররেস মাদারাসা আরবীয়া ইসলামিয়া, নিউ টাউন করাচী, মুহাম্মদ ইউসুফ বানোরী শেখুল হাদীস মুদাররেস মাদ্রাসা আরবীয়া ইসলামিয়া নিউ টাউন, করাচী)

শিয়াদের সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের আলেম সমাজ এই আতঙ্কমূলক শব্দে সাবধান করেন ঃ

"ঐ সকল রাফেজী তাব্বারীদের সম্পর্কে সুনিশ্চিত সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, তারা মোটের উপর কাফের ও মুরতাদ, তাদের যবাইকৃত প্রাণী মৃত। তাদের সাথে বিয়ে শুধু হারামই নয় বরং জেনার অন্তর্ভুক্ত (নাউযুবিল্লাহ্)। পুরুষ যদি রাফেজী আর মহিলা যদি মুসলমান হয় তাহলে তো ইহা ভয়ানক ঐশী অভিসম্পাতস্বরূপ। আর পুরুষ যদি সুন্নী হয় এবং মহিলা যদি সেই খবীসদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাদের বিয়ে মোটেও বৈধ হবে না, শুধু জেনা হবে এবং সন্তান হবে জারয। সন্তান সুন্নী হলেও পৈত্রিক সম্পত্তি পাবে না। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জারয সন্তানের কোন পিতা থাকে না। মহিলা না পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে, না মোহরানার অধিকারী হবে। কেননা, বেশ্যার কোন মোহরানা হয় না। রাফেজী নিজের কোন নিকটতম আত্মীয়ের, এমন কি পিতা-পুত্রের অথবা মাতা-কন্যার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাবে না, সুন্নী তো দূরের কথা কোন মুসলমানের বা কোন কাফেরের সম্পত্তি পাবে না। এমনকি স্বধর্মী রাফেজীর সম্পত্তিতেও প্রকৃতপক্ষে তার কোন অধিকার নেই। তাদের পুরুষ, মহিলা, আলেম, জাহেল কারো সাথেই মেলামেশা, সালাম, কথা বলা শক্ত কবীরা গুনাহ্ ও মারাত্মক হারাম। যে তাদের অভিশপ্ত বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও তাদেরকে মুসলমান মনে করে বা তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে সকল ইমামে দীনের সর্বসম্মত ফতওয়া অনুসারে সে নিজেই শক্ত কাফের ও বেদীন এবং ঐ একই ফতওয়া যা অন্যান্যদের জন্য বর্ণিত হয়েছে তা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক তারা যেন এই ফতওয়াকে কান খুলে শুনে এবং ইহার উপর আমল করে সত্যিকার ও খাঁটি সুন্নী হয়।"

(ফতওয়া মৌলানা শাহ মোস্তাফা রেযা খান-উদ্ধৃতি রেসালা রদ্দুর রাফেজী প্রকাশক-নূরী কুতুবখানা বাযারদাতা সাহেব, লাহোর পাকিস্তান ছাপা গুলযার আলম প্রেস, ভাটি গেটের বাহিরে, লাহোর -১৩২০)

"ইদানিং কালের রাফেজীরা প্রায় ক্ষেত্রে ধর্মের আহকামগুলির অস্বীকারকারী এবং নিঃসন্দেহে ধর্মচ্যুত। তাদের পুরুষ বা মহিলা কারো সাথেই বিয়ে হতে পারে না। অনুরূপভাবে ওহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, নেচারী, চক্‌ড়ালভী সকলেই ধর্মচ্যুত। এদের

পুরুষ বা মহিলাদের সমগ্র দুনিয়ার যার সাথেই বিয়ে হউক, সে মুসলমান হউক বা সত্যিকার কাফের হউক বা ধর্মচ্যুত হউক, মানুষ অথবা জানোয়ার হউক তা অবশ্যই অবৈধ, আর তা হবে খাঁটি জেনা এবং সন্তান হবে জারয।'

(আল্ মালফুঁয, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৮ সংকলনে মুফতী আযম হিন্দ)।

এখন দেওবন্দীদের সম্পর্কে আরব এবং অনারব আলেম সমাজের ফতওয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন। তারা বলেন ঃ

"ওহাবী ও দেওবন্দীরা নিজেদের উক্তিতে সকল নবী, সকল আওলিয়া, এমনকি সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ও আখারীনদের সর্দার (সঃ)-এর এবং বিশেষ করে আল্লাহ্তআলা অস্তিত্বের অসম্মানের ও অবমাননা করার কারণে নিঃসন্দেহে ধর্মচ্যুত এবং কাফের, এবং তাদের ধর্মচ্যুতি ও কুফরী জঘন্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এমনকি যে এই ধর্মচ্যুত এবং কাফেরদের ধর্মত্যাগ ও কুফরীতে একটুও সন্দেহ পোষণ করে সে-ও তাদের মতই ধর্মত্যাগী ও কাফের। যে এই সন্দেহকারীদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে সে-ও মুরতাদ ও কাফের। এদের থেকে মুসলমানদের দূরে ও পৃথক থাকা উচিত। তাদের পিছনে নামায পড়ার তো প্রশ্নই উঠে না, নিজেদের পিছনেও যেন তাদেরকে নামায পড়তে না দেয় এবং তাদেরকে যেন মসজিদে প্রবেশ করতে না দেয়। না তাদের যবাই কারী প্রাণী খায়, না তাদের সুখে-দুঃখে শামিল হয়, না তাদের নিজেদের মধ্যে আসতে দেয়। তারা অসুস্থ হলে দেখতে যেন না যায়, মরে গেলে পুঁতে ফেলা বা জ্বালানোর কাজে যেন অংশ গ্রহণ না করে। মুসলমানদের কবর স্থানে যেন স্থান না দেয়। এক কথায় তাদের থেকে যেন সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও সাবধান থাকে।"

ইহা হ'ল আহলে সুন্নতের শ্রদ্ধাভাজন আলেম সমাজের ফতোয়ার সারাংশ। এই ফতোয়া শুধু ভারতবর্ষীয় আলেম সমাজেই নয় বরং যখন ওহাবী দেওবন্দীদের উক্তিগুলি অনুবাদ করে পাঠানো হয়েছে তখন আফগানিস্তান, খীবা, বুখারা, ইরান, মিশর, রোম, সিরিয়া, মক্কা মুয়ায্যমা, মদীনা মুনাওয়ারা, সমগ্র দুনিয়ার আহলে সুন্নতের আলেম সমাজ সর্বসম্মতভাবে এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, "এই উক্তিগুলি দ্বারা আওলিয়া, আম্বিয়া আর স্বয়ং খোদতাআলার জঘন্য ও চরম অসম্মান ও অবমাননা হয়েছে। সুতরাং এই ওহাবী দেওবন্দীরা জঘন্য, চরম পর্যায়ের কাফের, এমন কাফের, যে তাদের কাফের বলে না সে নিজেই কাফের হয়ে যায়; তার স্ত্রী তার বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়। আর যে সন্তান হবে সে-ও জারয হবে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পত্তির অংশ পাবে না।'

(এলানকারী খাকসার মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভাগলপুরী ব্যবস্থাপনায় শেখ শিরকত হোসেন, ছাপাখানা বরকী প্রেস ইসতেয়াক মনযিল, পৃঃ ৬৩, হীউট রোড, লাখনৌ)

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ

(১) তকদীসুল উকীল (২) আস্সাইফুল মাসলুল (৩) আকায়েদে ওহাবীয়া দেওবন্দীয়া (৪) তারীখ দেওবন্দীয়া (৫) হেসামুল হারামাইন (৬) ফাতাওয়া হারামাইন

(৭) সওয়ারে মুলহিন্দীয়া আলা মকরে শায়াতীনুদ্ দেওবন্দীয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনেক বড় বড় ফতওয়া থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হ'ল যদ্বারা পাঠকবৃন্দ কুফরী ও ফতোয়াবাজীর ব্যাপারে চরমভাবাপন্ন আলেম সমাজের মনোবৃত্তির কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারেন। কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গী এমন চরমভাবাপন্ন নয়। এ বিষয়ে আমাদের জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গী হুবহু উহাই যা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ঐ সকল আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গী।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমাম মাহদী (আঃ) ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রেরিত হয়েছেন, সেই জন্য তাঁকে অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরী। আর হুবহু এই বিশ্বাসই ঐ সকল আলেমরা পোষণ করে এবং ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব তো বিশেষ করে এই বিশ্বাস রাখেন। তার মতে ইমাম মাহদী যখনই আসবেন তাঁকে অস্বীকারকারীগণ কাফের বলে পরিগণিত হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আমরা এই সঙ্গত কথাকে মানা সত্ত্বেও তাকে অমুসলিম আখ্যা দেই না। এই মৌলভী সাহেব আমাদের উপর শুধু শুধু মিথ্যা আরোপ করছেন। আপনারা সর্বদা আমাদের বই পুস্তকে "গয়র আহমদী মুসলমান বা অন্যান্য মুসলমান' পরিভাষাটি পড়ে থাকবেন। আর যখনই জামাতে আহমদীয়ার পুস্তকাবলীতে 'গয়র আহমদী' শব্দ লেখা হয় তা অর্থ হয় 'অন্যান্য মুসলমান', যারা ইমাম মাহদীর অস্বীকারকারী।

সুতরাং ঐ ব্যক্তি যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনে সে ইমাম মাহদীকে অস্বীকার করলেও আমরা তাকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি না, বরং গয়র-আহ্মদী মুসলমান বলে থাকি যা প্রচলিত কুফরী হতে ভিন্ন অন্য এক কুফরীর সাথে সম্পর্ক রাখে। কুফরীর অর্থ এতটুকুই যে, সত্যিকারের এবং খাঁটি মুসলমান রইল না। কেননা, সে খোদার প্রেরিত এক ইমামকে অস্বীকার করে বসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক মুসলমানের নিজেকে মুসলমান আখ্যা দেয়ার অধিকার আছে এবং আমরা বিশ্বাস রাখি যে, খোদাতাআলা এই অধিকার দিয়েছেন এবং কেউ এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। এমন কি যদি কোন ফেরকার মুসলমানকে অমুসলিম ধরেও নেই, তবুও আমাদের এই ধরে নেয়া হতে ইহা প্রতীয়মান হতে পারে না যে, তাকে মুসলমান নাম রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিই। জামাতে আহমদীয়ার এই বিশ্বাস শুধু বিবেকসম্মত নয়, বরং একশ' ভাগই কুরআনের নিম্নবর্ণিত শিক্ষাসম্মতঃ

قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا
ولما يدخل الايمان فى قلوبكم (الحجرات ايت ١٥)

অর্থাৎ "জংলীরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি তাদেরকে বলে দাও তোমরা প্রকৃত পক্ষে ঈমান আন নি, কিন্তু তোমরা এই বলে যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কেননা, ঈমান এখনো তোমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে নি।"

(সূরা হুজুরাত, ১৫ আয়াত)

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই সমস্ত মৌলভীদের দৃষ্টিভঙ্গী এরূপ নয়। বরং যে সমস্ত ফেরকাকে তারা কাফের বলে তাদের অমুসলিম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত জ্ঞান করে।

আহমদীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার

লুধিয়ানভী সাহেব নিজের বক্তৃতায় এই কৃপাও প্রদর্শন করেছেন যে,

"আমরা আহমদীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার করছি। এবং তাদের উপর কোন অবরোধ আরোপ করা হয়নি।"

অশ্চের্যের কথা যে, মৌলভী সাহেব পাকিস্তানের কোন্ অংশে জীবন যাপন করছেন? এই মৌলভী সাহেবদের উদ্যোগের কারণেই তো স্বৈরাচারী জিয়াউল হক আহমদীয়া জামাতের উপর অবরোধ ঘোষণা ক'রে রেখেছে। অবরোধসমূহের কিছু অংশ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

(১) ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে পারবে না, যেমন সাহাবী, খলীফাতুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মু'মিনীন, রাযি আল্লাহু আনহু, আহলে বয়াত, উম্মুল মু'মিনীন, মসজিদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না।

(২) আযান দিতে পারবে না। কোনভাবেই মুসলমান হওয়া প্রকাশ করতে পারবে না। তবলীগ এবং নিজের বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সরকারী অধ্যাদেশ আকারে মুদ্রিত এ সব অবরোধ সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত আছেন।

আহমদীদের উপর নিষ্পেষণের ঘটনা প্রত্যেক দিন পাকিস্তানের পত্রিকাতে এরূপে ছাপা হয়ে থাকে যে, কাউকে কলেমা পড়ার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে, কারও ঘরে বিসমিল্লাহ্ লেখা থাকাতে তাকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে ইত্যাদি। এই সমস্ত নিষ্পেষণের অগণিত ঘটনা রয়েছে। কুরআন করীমের আয়াত পর্যন্ত রাখা একটা অপরাধে পরিণত হয়েছে। শুধু "দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্ত"-এর পরিসংখ্যানের প্রতি দৃষ্টিগোচর করুন। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩১১৩ জন আহমদীকে উপরোক্ত কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রকৃত সংখ্যা " নওয়ায়ে ওয়াক্ত" -এর ঐ পরিসংখ্যান থেকে বেশী, আর ১৯৮৮ সালের পর থেকে এই সংখ্যা তো আরও বেড়ে গেছে। ১৯৮৮ পর্যন্ত সময়ের রেকর্ড এই পত্রিকা নিম্নলিখিতভাবে পেশ করেছে।

১২৫	জনকে	গ্রেপ্তার করা	হয়েছে	নিজেকে মুসলমান বলার কারণে।
৫৮৮	"	"	"	" কলেমা তৈয়্যবার ব্যাজ পরার কারণে।
১৭৮	"	"	"	" মসজিদের উপর কলেমা লেখার কারণে।
২০৪	"	"	"	" আযান দেয়ার কারণে,
৭৬	"	"	"	" ইসলামী বেশভূষা পরিধান করার কারণে।

তাছাড়া ১৪২১ জন আহমদীকে অন্যান্য অযুহাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(নওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১১ই সেপ্টম্বর, ১৯৮৮)

সাধারণ মানুষ এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, আর এই মৌলভী সাহেব বলেন যে, আহমদীদের উপর কোন অবরোধ আরোপ করা হয় নি অথচ মৌলভী সাহেবও এসব ঘটনা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। কিন্তু যেহেতু তার চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তীত হয় নি, সে জন্য আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন করতে চাই যে, তারা যেন এই সমস্ত সুবিধাবলী আহমদীদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের এই বিরুদ্ধবাদী মৌলভী এবং তাদের অনুসরণকারীদেরকে দিয়ে দেন এবং আমাদের পরিবর্তে তাদের সাথে এরূপ নমনীয় ব্যবহার করেন।

সেই সুর গায় যা আসমান গায় না

লুধিয়ানভী সাহেব শ্রোতৃবৃন্দকে নসিহত্ করেন যে, "আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই যে, পৃথিবীতে যেন একজন কাদিয়ানীও জীবিত না থাকে। ... ... অন্ততঃপক্ষে এতটুকু তো হওয়া উচিত যে, আমরা কাদিয়ানীদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করি। তাদেরকে নিজেদের কোন মজলিসে, কোন মাহফিলে যেন জায়গা না দেই।"

ইংরেজী প্রবাদ আছে The cat is out of the bag. এখন বুঝতে পারলাম মৌলভী সাহেবের মতে নমনীয়তার অর্থ কী। দেখুন যে এটা কি ধরনের নমনীয় ব্যবহার যা আহমদীদের সাথে করার জন্য তিনি অন্যদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। আরো আমাদের উওর হলো, মৌলভী সাহেব এই সুবিধা নিজের জন্য এবং নিজের মুরীদদের জন্য অব্যাহত রাখুন। যদি ইহাই সুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্তাআলা আপনাকেই এই সুবিধা দান করুন। আপনার আত্মাভিমানের প্রকৃত প্রত্যাশা এবং আপনার মনের এই বাসনা যে, একজন কাদিয়ানীও যেন দুনিয়াতে জীবিত না থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার হৃদয়ের কম্পন ঐশী অভিপ্রায়ের প্রতিকূল আর আপনি হযরত মির্যা সাহেবের এই উক্তির সত্যায়নকারী যে,

"রাগ গাতা হ্যায় জিসকো আসমান গাতা নেহী
ওহ এরাদে হ্যায় কে যো হ্যাঁয় বরখেলাফে সাহরিয়ার।"

(অর্থাৎ সে ঐশী ইচ্ছার পরিপন্থী সুর গাচ্ছে, বাদশাহ্র ইচ্ছার পরিপন্থী বাসনা পোষণ করছে – অনুবাদক)

সুতরাং ইহা আশ্চর্যজনক কথা যে, আপনার স্বগোত্রীয় লোকেরা যখনই জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে তখন তার মোকাবেলায় খোদাতাআলা জামাতকে প্রভূত উন্নতি দান করছেন। আপনার পীর ও মুর্শেদ জিয়া সাহেব যে সময় এই ঘোষণা করলেন যে, আমি এবং আমার সরকার পৃথিবী থেকে আহমদীদের নির্মূল করার নিমিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই সময় জামাতের অস্তিত্ব ৯০ এর অধিক দেশে বিদ্যমান ছিল না। তার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পর খোদার ফযলে এখন জামাত আরো ৩৪টি (বর্তমানে প্রায় ৭০টিরও বেশী দেশে –প্রকাশক) দেশে প্রসারতা লাভ করেছে। এ ছাড়া সকল স্থানে উন্নতির গতি এত দ্রুত বাড়ছে যে, যদি আপনি অবগত হন তাহলে আপনার হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং এই কথাটি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে নয়, বরং বুঝানোর উদ্দেশ্যে লিখছি যে, যদি আপনি তেমনই মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং ইসলামের সেবক হয়ে থাকেন, তাহলে খোদাতাআলা আপনার সকল কামনাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে জামাতকে প্রসারতা দিয়ে যাচ্ছেন। فاعتبروا يا اولى الابصار (হে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি! তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর)। এখানে আমরা "উলুল আলবাব" লিখছি না, কারণ পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে আপনি অন্য যে কোন গোত্রভুক্ত হোন না কেন বিবেকবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না।

আরও একটি মিথ্যা অপবাদ

মৌলভী লুধিয়ানভী সাহেব জামাতে আহমদীয়ার উপর আরও একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ লাগিয়েছেন যে, জামাত ১৪ শতাব্দীর মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে।

ইহাও তার মিথ্যা অপবাদ লাগানোর আর একটি ধরন। বস্তুতঃ তিনি নিজে সত্যি সত্যিই ১৪০০ বৎসরের মুসলমানদের উপর অপবাদ লাগিয়েছেন। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার শত বর্ষ পূর্ণ হলো। কিন্তু এ জামাত কখনও অন্যান্যদের প্রতি কুফরবাজীর ফতওয়াকে প্রশ্রয় দেয় নি।

জামাতে আহমদীয়া শুধু ইহা বলে থাকে যে, যদি এই ব্যক্তিই সত্য ইমাম মাহদী হয়ে থাকেন তাহলে খোদার দৃষ্টিতে তার অমান্যকারীগণ কাফের সাব্যস্ত হয়। মির্যা সাহেব যখন দাবীই করলেন ১৮৮৯ তে তখন গত ১৪ শত বৎসরের মুসলমানদের জন্য তাঁকে কীভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। ইহা মৌলভী সাহেবর এমন অপবাদ, যদ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চান। গত শতাব্দীর মুসলমানদের সম্পর্কে মির্যা সাহেব জামাতকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলো নিম্নরূপ এবং ইহাই গত ১৪ শতাব্দীর মুসলমানদের সম্পর্কে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস। যদিও এই মৌলভী মিথ্যা বলে বেড়াছে।

হযরত মির্যা সাহেব নবী (সঃ)-এর আহলে বয়াত সর্ম্পকে বলেন ঃ

جلن و دلم فدائے جمال محمد است

خاکم نثار کوچۂ ال محمد است

অর্থাৎ "আমার প্রাণ ও মন মুহাম্মদ (সঃ)-এর সৌন্দর্যে নিবেদিত। আমার দেহের মাটি মুহম্মদ (সঃ)-এর পরিবারের গলির জন্য উৎসর্গীকৃত।

(ফারসী দুররে সমীন, পৃঃ ৮৯,নেযারাতে এশাআত, রাবওয়া)

রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণ

"আঁ-হযরত (সঃ)-এর জামাত তাঁদের প্রিয় রসূলের ভালবাসায় এমনই একতা ও আধ্যাত্মিক সমতা সৃষ্টি করেছিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী শিক্ষানুসারে তারা একই শরীরের বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিলেন । অধিকন্তু তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও দৈনন্দিন

জীবন-পদ্ধতির বাহির ও অভ্যন্তরে নবুওয়তের জ্যোতিঃ এমনভাবে সম্পৃক্ত ছিল যেন তারা সকলেই আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিলেন" (ফতেহ্ ইসলাম, পৃঃ ৩৫, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩য়, পৃঃ ২১)

বার ইমাম

"বার ইমাম অত্যন্ত পবিত্র, সরল প্রাণ এবং ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের উপর সত্য দিব্যদর্শনের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছিল।"

(এযালায়ে আওহাম ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৫৭, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩য় ,পৃঃ ৩৪৪)

চার ইমাম

" এই চার ইমাম ইসলামের জন্য চারটি প্রাচীরের মত ছিলেন।"

(আল্ বদর ৩রা নভেম্বর, ১৯০৫, পৃঃ ৭৪)

উম্মতের পুণ্যবান ব্যক্তিগণ

"আমাদের নেতা প্রভু আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগ হতে অদ্যাবধি এমন খোদাভক্ত লোকদের অগমন ঘটে আসছে, যাদের মাধ্যমে ঐশী নির্দশন প্রকাশপূর্বক আল্লাহ্তাআলা ভিন্ন জাতিদেরকেও হেদায়াত দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, আবুল হাসান খেরকানী, আবূ ইয়াযীদ বোস্তামী, জুনায়েদ বাগদাদী, মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী, যুন্নুন মিসরী, মুইনুদ্দীন চিশ্তী আজমীরী, কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, ফরীদউদ্দিন পাকপটনী, নেযামউদ্দিন দেহলভী, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী ও শেখ আহমদ সরহন্দী (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট) ইসলামে অতিবাহিত হয়েছেন এবং তাঁদের সংখ্যা সহস্র সহস্র পর্যন্ত উপনীত হয়েছে।

এত অধিক সংখ্যায় তাদের অলৌকিক ঘটনা আলেম ও ফাযেল সমাজের পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, একজন বিরুদ্ধবাদীকে শক্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও অবশেষে স্বীকার করতে হয় যে, এই সকল লোকেরা অসাধারণ ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। এই উম্মতের আউলিয়াদের মাধ্যমে সেই পরিমাণ নিদর্শন ইসলাম ও আঁ হযরত (সঃ)-এর সমর্থনে প্রকাশ পায় যার দৃষ্টান্ত ভিন্ন ধর্মে বিরল" (কিতাবুল বারিয়্যা রূহানী খাযায়েন খণ্ড ১৩ পৃঃ ৯১-৯২)।

পুনরায় বলেন "চরম বিদাত বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও উম্মতের মধ্যযুগীয় পুণ্যবান লোকেরা বিশাল সমুদ্রের ন্যায় ছিলেন" (তোহ্ফা গোলড়বিয়া, পৃঃ ৮১, প্রথম প্রকাশ)।

মৌলভী সাহেবের একটি অযৌক্তিক দৃষ্টান্ত

মৌলভী সাহেব নিজের অপবাদকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন যে, "একটি দুর্বল উদাহরণ পেশ করছি তাহলো, "এক পিতার দশ পুত্র ছিল। সারা জীবন তাদের পুত্র আখ্যা দেয়া অব্যাহত রেখেছিল। পিতা মারা গেল। তার মৃত্যুর পর এক

অচেনা ব্যক্তির উদয় হলো। সে দাবী করে বসলো যে, সে-ই মরহুমের বৈধ সন্তান। এই দশ জনের সকলেই অবৈধ।"

মৌলভী সাহেব আরো অহমিকা প্রকাশ করে লিখেন, "১৩ শতাব্দীর মুসলমানেরা হুযুর (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান ছিলেন। ১৪ তম শতাব্দীর শিরোভাগে মির্যা গোলাম আহমদ দাঁড়িয়ে বললো যে, হুযূরের আধ্যাত্মিক সন্তান একমাত্র আমি, বাকী সমগ্র মুসলমান কাফের।"

লুধিয়ানভী সাহেব আপনি সাব্যস্ত করে দিলেন যে, আপনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি-বিবেকহীন। এমন উদাহরণ উপস্থাপন করলেন যে, নিজের জালে নিজেই হাতে নাতে ধরা পড়লেন এবং এই জাল হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আপনার কোন উপায় নেই। আপনার দাবী ও কথা বলার ভংগী দেখে মনে হয় যে, না কুরআনের প্রতি আপনার মনোযোগ আছে, না হাদীসের প্রতি, না সুন্নতের প্রতি, না খোদা-প্রেমিকদের কথার প্রতি, তা' সত্ত্বেও আক্রমণের আক্রোশ আপনার এত প্রবল যে, দেখারও সময় পান না আক্রমণ কার উপর হচ্ছে এবং এতে পরিণাম কি দাঁড়াবে। আপনি ১০ সন্তানের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা এমন বাজে ও অশালীন যে ধর্মীয় বিষয়ে তা উপস্থাপন করতে গিয়ে আপনার লজ্জাবোধ করা উচিত ছিল।

প্রথমতঃ আপনার মস্তিষ্ক কিসে ভরা ইহা হতে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবং আপনার কি সে কথা মনে পড়ে নি যা হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন?

তিনি (সঃ) বলেছেন ঃ تفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة

অর্থাৎ "আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে।"

মৌলভী সাহেব আপনি দশজন নিয়ে কাঁদছেন, আর হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ) উম্মতের ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সাবধান করেছেন এবং বলেছেন, كلهم فى النار الا ملة واحدة

অর্থাৎ "শুধু একদল ছাড়া বাকী সকলেই অগ্নিতেই থাকবে।"

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাব এফতেরাকু হাযিহিল উম্মাহ্)।

কোন হতভাগা ছাড়া এমন বে-আদবীর দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাবে না, যা আপনি প্রদর্শন করেছেন। আপনার কথাই হুবহু নকল করে তুলে ধরছি। উক্ত হাদীসের প্রতি নজর রেখে আপনিই অর্থ করুন ঃ "কোন ব্যক্তির ৭২ সন্তান ছিল। সে সারাজীবন তাদের সন্তান আখ্যা দিচ্ছিল। পিতার মৃত্যুর পর একজন অপরিচিত ব্যক্তি উঠে এই দাবী করলো যে আমি তার বৈধ সন্তান।"

তাছাড়া আপনি জানেন যে, উম্মত মুহাম্মদীয়ার প্রত্যেক দল এই দাবী রাখে যে, তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যেরা ভ্রান্তিতে রয়েছে বরং এত জঘন্য ভ্রান্তিতে রয়েছে যে কাফের হয়ে গিয়েছে।

হে ধর্মান্ধ মৌলভী সাহেব! আপনি কি এখানে সেই নীচ ও হীন উদাহরণকে প্রযোজ্য হতে দেখেন নি ? সুতরাং দেখুন ঃ اذا لم تستحى فاصنع ما شئت

অর্থাৎ "যখন তোর মধ্যে লজ্জাই নেই, তোর মন যাহা চাহে কর।"

(মেশকাত বাবুর রিফক ও হুস্নে খাল্ক)

মৌলভী সাহেব আপনি মিথ্যাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার দাবী করেছেন।

আমরা আপনারি সকল মিথ্যাকে সম্পূর্ণরূপে জনসমক্ষে তুলে ধরেছি। কিন্তু আপনার মিথ্যার শাখা-প্রশাখাও এত অধিক বিস্তৃত যে, আমরা কোন্ কোন্ মায়ের কথা বলবো? যাই হোক, বিষয়টা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, অতীতে খোদার পবিত্র বান্দাদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণাদাতা ও নোংরা লোকেরা যে ধরনের মিথ্যা ছড়িয়েছে, জনাব মৌলানা সেগুলোর মধ্যে সকল মিথ্যাকে নির্দ্বিধায় অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব, আপনার সকল অশালীন অপপ্রচেষ্টাকে আমরা উলংগ করে দিয়েছি।

আপনার মিথ্যার এত সকল 'মা'কে চিহ্নিত করার পরিবর্তে আমরা যদি কুরআন শরীফে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন করীম বুযর্গদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এরূপ অন্ধ বিরুদ্ধবাদীদের জন্য একটি মায়ের কথা উল্লেখ করে, আর তাহলো- فامه هاوية

অর্থাৎ তাদের 'মা' হাবিয়া জাহান্নাম। সুতরাং আপনাকে এই হাবিয়ায় সোপর্দ করে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

কিন্তু বিদায়কালে এই বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি। 'ইংরেজ' তাদের 'মা' সাব্যস্ত হবে যারা ইংরেজদের খোদা "হযরত ঈসা (আঃ)"-কে তাদের অনুকরণে আকাশে উঠিয়ে রেখেছে। যারা তাদের খোদার একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছে ও তাকে চিরতরে ধরাশায়ী করে রেখেছে ইংরেজ তাদের 'মা' কি করে হয়?

সমাপ্ত

"KIA AHMADI SACCHE MUSALMAN NEHI HAIN"

"ARE AHMADIES TRUE MUSLIMS?"

This is a treatise in answer to a booklet written by one Maulana Mohammad Yusuf Ludhianvi titled "Qadianion aur dusre kafiron ke darmiyan farq" ("The difference between the Qadianis and other non-believers").

The author examines in detail the arguments put forward by Maulana Sahib and quotes the different "fatwas" (religious edicts) of "kufr" issued by the various sects in Islam against each other. He then goes on to prove, on the basis of the Holy Quran and the Hadith, that the door to non-law-bearing prophethood is open among the Muslim Ummah after the advent of the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him.

© Islam International Publications Limited

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলমানের সংজ্ঞা

কিছু সংখ্যক বেদুঈন আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাস করার পর তাঁর (সঃ) শিক্ষার প্রকাশ্য পরিপন্থী কাজ করলেও খোদাতাআলা তাদের অমুসলিম বলার অনুমতি দেননি। বরং বলেছেন যে, '(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, কারণ (এখনও) ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি' (হুজুরাতঃ ১৫)।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

১. "সে-ই মুসলমান যার জিহ্বা ও হাতের আক্রমণ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ" (বুখারী ঃ কিতাবুল ঈমান)।

২. 'ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি, আর সেগুলো হলো ঃ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো পালন করে সে-ই মুসলমান। তাকে অমুসলমান বলার কারো কোন অধিকার নেই'।

৩. 'যে আমাদের মতো নামায পড়ে, আমাদের কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে এবং আমাদের যবাই করা প্রাণীর মাংস খায় সে-ই মুসলমান যার যিম্মা খোদা এবং তাঁর রসূল (সঃ) নিয়েছেন। সুতরাং খোদার যিম্মাদারী পালনে তোমরা হস্তক্ষেপ করো না' (বুখারী ঃ কিতাবুস্ সালাত)।

৪. একবার মদীনাতে আদম শূমারীর প্রাক্কালে আঁ হযরত (সঃ) বলেন ঃ 'মানুষের মধ্য হতে যে নিজে মুসলমান হওয়ার দাবী করে তাকে আমার জন্যে তালিকাভুক্ত করে নাও।'

"KIA AHMADI SACCHE MUSALMAN NEHI HAIN"
By : A. S. Musa
Translated into Bengali by
Maulana Firoz Alam, Sadar Murabbi
Published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh